৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২১ বিশেষ সংখ্যা

সমবায়

বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন

সমবায় অধিদপ্তর

আগারগাঁও, ঢাকা

সমবায় অধিদপ্তর

আগারগাঁও, ঢাকা

সমবায়

নভেম্বর ২০২১ বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি
মোঃ আহসান কবীর
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য
মোঃ জিল্লুর রহমান
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

শাকিলা হক
উপনিবন্ধক (পিপি)

মোঃ আবুল খায়ের
উপনিবন্ধক (ইপি)

সদস্য সচিব
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মনিরুল ইসলাম

মুদ্রণ
তিথী প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
২৮সি/১, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

* নিবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৯১৪০৮৭৭,৮১২৯৬৫৪,৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩, ই-মেইল : coop_bangladesh@yahoo.com
ওয়েব সাইট : www.coop.gov.bd,ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২১ কার্তিক ১৪২৮
০৬ নভেম্বর ২০২১

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ। সমবায়কে তিনি উন্নয়নের অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। সমবায় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ছিল গভীর এবং ব্যাপক। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ''আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।''

বাংলাদেশের কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগসহ উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিসহ নারীর ক্ষমতায়ন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় একটি কার্যকরী পদ্ধতি। কোভিড-১৯ এর কারণে সারাবিশ্ব বর্তমানে এক কঠিন সময় পার করছে। সমবায় পদ্ধতির পারস্পরিক সহযোগিতা, সমবেত প্রচেষ্টা ও মূল্যবোধের চর্চা বর্তমান সংকট উত্তরণে ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৯৬ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে। এ সকল সমবায় সমিতি শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, বিপণন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নসহ সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে নিয়েছিলেন বহুমুখী পরিকল্পনা, দিয়েছিলেন অর্থনীতির নতুন ফর্মুলা। তাঁরই উদ্ভাবিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন বাস্তবে রূপ দিতে তিনি সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তিকে পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক দর্শন 'সমবায়' এর শক্তিকে একটি গণমুখী সমবায় আন্দোলনে পরিণত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবসের সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা,

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ কার্তিক ১৪২৮
০৬ নভেম্বর ২০২১

বাণী

সারাদেশে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল সমবায়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এবারের সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'—অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ-স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে নির্ধারণ করেন তিনি। এদেশের গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য জাতির পিতা গণমুখী সমবায় আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের অন্যতম সমবায় প্রতিষ্ঠান 'মিল্কভিটা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতেই গড়ে ওঠে।

জাতির পিতার অন্যতম উন্নয়ন দর্শন ছিল 'সমবায়'। সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্যমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৯৬ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে, যার ব্যক্তি সদস্য প্রায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ। সমবায় দেশের কৃষি, মৎস্যচাষ, পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, পরিবহণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, আবাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সমবায় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এবং পরবর্তীতে সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। সমবায় খাতে বাজেট বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের কারণে সমবায়ীদের জীবনমান ও সামাজিক উন্নয়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুজিববর্ষে জাতির পিতার গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে 'বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ' করার কাজে হাত দিয়েছি আমরা। প্রাথমিকভাবে দেশের ৯টি জেলার ১০টি গ্রামের মোট ৫ হাজার মানুষ এ প্রকল্পের সুফল পাবেন। গ্রামের আয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত গ্রামীণ জীবনযাপনের সুযোগ ও গ্রাম থেকে শহরমুখী জনস্রোত কমাতে এ প্রকল্প ভূমিকা রাখবে।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ করে চলেছে। আশা করি, সরকারের এ লক্ষ্য পূরণে দেশের সমবায় সংগঠনগুলো অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২১ এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে নানান কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে সারাদেশে জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এবারের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী। বঙ্গবন্ধু গণমানুষের টেকসই উন্নয়নের জন্য সমবায় পদ্ধতিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ও এদেশের সমবায় আন্দোলন এক ও অভিন্ন। জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার ২য় খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। জাতির পিতা স্বপ্ন দেখতেন কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার। বঙ্গবন্ধু কৃষি, শিল্প, ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলতেন।

গ্রাম ও শহরের উন্নয়নকে এক সূত্রে গাঁথার অন্যতম মাধ্যম সমবায়। এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর উন্নয়ন চিন্তার অন্যতম মডেল ছিল গ্রাম-সমবায়। জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসুরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সমবায়কে একইভাবে লালন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসের ভাষণে বলেছেন, "এটা পরীক্ষিত যে, বহুমুখী গ্রাম সমবায় আমরা যদি গড়ে তুলতে পারি, বাংলাদেশে কোন দারিদ্র্য থাকবে না।" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ উন্নয়ন নির্দেশনার আলোকে এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর বিশেষ অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম, আমার শহর' ধারণাকে সামনে রেখে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক শহরের সুবিধা গ্রামে সৃষ্টির লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম' প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প গ্রহণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় সমবায় অধিদপ্তরের নেতৃত্বে দেশের সমবায়ীরা উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় যথাযথ অবদান রেখে চলেছে।

আমি ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

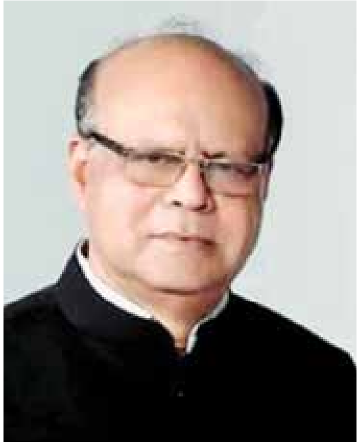

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সারাদেশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ দিনে আমি দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দারিদ্র্যমোচনে সমবায় একটি প্রাচীন ও পরীক্ষিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। প্রতিটি সমবায় হচ্ছে এমন এক আর্থসামাজিক প্রতিষ্ঠান যা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে যা সমাজ জীবনে আদর্শ ও মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে সমবায় পদ্ধতি শত বছরের অধিক সময়ের অনুসৃত একটি অর্থনৈতিক কৌশল যা পুঁজিবাদের অসম প্রতিযোগিতার মাঝে সগৌরবে মাথা উঁচু করে টিকে আছে। বর্তমান সরকারের টেকসই উন্নয়নের যে লক্ষ্য রয়েছে সেক্ষেত্রে সমবায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী ও বেকার জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অন্যতম সোপান হচ্ছে সমবায়। সমবায়ের এই আদর্শকে অনুসরণ করে পৃথিবীর বহুদেশ নিজেদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রেখেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সত্যকে অনুধাবন করেই সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশ একদিন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বেদে, হিজড়া, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও নারী উন্নয়নে সমবায়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর দেশের প্রতিটি উপজেলায় ‘বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি’ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় করা সম্ভব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সমবায়ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়নে উদ্যোগটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি আশা করি, সমবেতভাবে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সমবায় সমিতিগুলো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আমি জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মকাণ্ডের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

আজ ৬ নভেম্বর, ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২১। এ উপলক্ষ্যে দেশের সকল সমবায়ী ভাই ও বোনকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এবছর জাতীয় সমবায় দিবসে গৃহীত প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন ভাবনাকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করেছে। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হচ্ছে। একই সময়ে আমরা উদ্‌যাপন করছি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যা এবারের জাতীয় সমবায় দিবসকে দিয়েছে নতুনমাত্রা।

দারিদ্র্যমোচন ও টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে সমবায় সারাবিশ্বে একটি প্রতিষ্ঠিত কৌশল। সমবায় অর্থনীতি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি যা ব্যক্তির সৃজনশীলতাকে সামষ্টিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে বিকশিত করে। পাশাপাশি নিশ্চিত করে সুষম উন্নয়ন। বঙ্গবন্ধু যথাযথভাবে উপলব্ধি করেই ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেয়া ভাষণে সমবায়কে গ্রামোন্নয়নের প্রধান কৌশল হিসেবে বেছে নেয়ার ঘোষণা দেন। তিনি প্রতিটি গ্রামে বহুমুখী সমবায় সমিতি গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। আজ বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের অর্থনীতি অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাস জনিত অতিমারির কারণে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে মুজিব শতবর্ষে নানাবিধ বড় বড় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশ ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে, রচিত হচ্ছে উন্নয়নের নতুন নতুন ইতিহাস।

সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের মূল উপজীব্য। আয়বৈষম্য হ্রাসকরে জাতির পিতা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় সমবায় সংগঠনগুলো পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মধারায় নীরবে প্রবাহমান স্রোতের মতো বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আমি সমবায় আন্দোলনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও জাতীয় সমবায় দিবসের সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হচ্ছে। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, গুরুত্ববহ ও সময়োপযোগী। জাতীয় সমবায় দিবসের এ শুভক্ষণে আমি দেশের সকল সমবায়ী ও সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উষ্ণ অভিনন্দন ও অকৃত্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ আজ এক অনন্য উদাহরণ। এই উদাহরণ অগ্রগতির উদাহরণ। করোনা মহামারিতেও বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্থনীতিতে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ যা বিশ্ব বাস্তবতায় সন্তোষজনক। করোনা মহামারিতে এ প্রবৃদ্ধি আমাদের জন্য এক বিশাল অর্জন। বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, বাংলাদেশ একদিন ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন। এক শতাব্দীরও অধিককাল ধরে সমবায় ব্যবস্থা দেশের দারিদ্র্যমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি এত দীর্ঘ সময় টিকে থাকার পেছনেই নিহিত রয়েছে এর গ্রহণযোগ্যতা ও উপযুক্ততা।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন একটি পরীক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যার বিস্তার রয়েছে গ্রামীণ জনপদে, নগরজীবনে এবং আধুনিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে সংগঠিত করে মানুষের অংশগ্রহণে তিনি ইতিহাসের সর্ববৃহৎ মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সকল কার্যক্রমে মানুষের সক্রিয় অন্তর্ভুক্তির ভাবনার মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু এবং সমবায় শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনমান পরিবর্তনের জন্য সমবায় যেমনিভাবে অন্যতম কৌশল হিসেবে ভূমিকা রেখেছে তেমনিভাবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁরই উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ চেতনায় ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস সফল হোক সার্থক হোক এ কামনা করি।

মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

বাণী

৫০ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পালিত হচ্ছে এবারের সমবায় দিবস। বিশ্ব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় নব উত্তরণকালে এবারের সমবায় দিবস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

স্বাধীনতার এই সুবর্ণজয়ন্তীতে প্রথমেই আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। বঙ্গবন্ধুর অন্যতম উন্নয়ন দর্শন ছিল সমবায়। মহান মুক্তিযুদ্ধের পরে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল ধ্বংসস্তূপ, যুদ্ধবিধ্বস্ত সেই স্বাধীন বাংলাদেশকে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে উন্নয়নের পথে নিয়ে যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরি তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।

উন্নয়নের মহাযাত্রায় আমরা নিম্ন আয়ের দেশ হতে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সকল শর্ত পূরণ করেছি। আমরা এমডিজি অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছি। এখন এসডিজি অর্জনের জন্য আমাদের দরকার অংশীদারিত্বমূলক টেকসই উন্নয়ন। দেশের প্রতি পাঁচ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের একজন যেখানে সমবায়ী সেখানে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমবায়ই হতে পারে অন্যতম মাধ্যম। সমবায় এমন এক অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন দর্শনে বিশ্বাস করে যেখানে একদল মানুষ সক্রিয় অংশ নিয়ে নিজেদের উদ্যোগে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম।

বর্তমানে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩১৬টি সমবায় সমিতিতে ১ কোটি ১৭ লক্ষের অধিক সমবায়ী রয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ সকল সমবায় সমিতি সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ, ঋণদান কার্যক্রম, আবাসন, পুষ্টিচাহিদা পূরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে প্রাথমিক সমবায়ীদের ২৩% মহিলা সে হিসেবে দেশের প্রায় ২৭ লক্ষ ২৬ হাজার নারী প্রত্যক্ষভাবে সমবায়ের সাথে জড়িত। অধিকন্তু সমবায়ীদেরকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রেও সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সমবায়ের সমস্যা ও দুর্বলতাসমূহ দূরীভূত করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আমি ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ

বাণী

০৬ নভেম্বর, ২০২১ শনিবার ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস। বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যদিয়ে সারাদেশে জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আজকের এ উৎসবমুখর দিনে আমি বাংলাদেশের সকল সমবায়ী ভাইবোনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যমোচনে সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে দরকার উন্নয়নের পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণ। স্বল্প স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠন তৈরি করে মানুষদেরকে উন্নয়নের অংশীদার করার জন্য সমবায়ই হতে পারে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। সমবায়ের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করে শোষণহীন সুখী সমৃদ্ধ, ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্যে বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

বর্তমানে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সমবায় খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। সমবায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ নাদির হোসেন লিপু

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধু-মুজিববর্ষ-সমবায় : ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস	১৩
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় : বিস্তারিত দৃষ্টি : আমিনুল ইসলাম	২১
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও কৃষি সমবায়ের সাফল্যগাথা : ড. জাহাঙ্গীর আলম	৩৩
আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সমবায় : ড. মিল্টন বিশ্বাস	৩৬
টেকসই উন্নয়নের নতুন ধাপ সমবায়ভিত্তিক পর্যটন : ড. সন্তোষ কুমার দেব	৪০
বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা ও আমার ইচ্ছাবাড়ি : মোখলেছুর রহমান	৪৩
টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদনে সমবায় : ড. কাজী রেজাউল ইসলাম	৪৮
বঙ্গন্ধুর সমবায় ভাবনার বাস্তবায়ন : প্রেক্ষিত সংস্কার ও আধুনিকায়ন : ড. ফোরকান উদ্দিন আহমদ	৫০
একটি প্রকল্পের সমাপ্তি : আশার ডানায় নতুন প্রত্যাশা : মোঃ জিল্লুর রহমান	৫৩
নারীর ক্ষমতায়নে আইজিএ প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা : প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ : মোহাঃ আব্দুল মজিদ	৫৭
প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নই হতে পারে সোনার বাংলা গড়ার প্রধান হাতিয়ার : মোঃ জিয়াউল হক	৬০
আন্তর্জাতিক সমবায় জোট : এম এম মোর্শেদ	৬২
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ : প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম : মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন	৬৬
করোনা ক্রান্তি ও সর্বসাধারণের সমবায়শিক্ষা : সোহেল নওরোজ	৬৯
সমবায়ে খ্রিস্টান মূল্যবোধ : রাফায়েল পালমা	৭২
বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের যাত্রায় বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ	৭৫
বঙ্গবন্ধুর সাহচর্যে রাজনীতি এবং রাজনীতিক থেকে সমবায়ী মরহুম রওশন আলী	৭৯
সমবায় সংবাদ	৮১-৯১
রাঙুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়	৯২
বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ	৯৪
মঠবাড়ি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ	৯৬
আলিফ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	৯৯
বঙ্গবন্ধু'র ভিলেজ কো-অপারেটিভ বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা শুরু	১০১
জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রাপ্ত সমবায় সমিতি ও সমবায়ীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১০৪

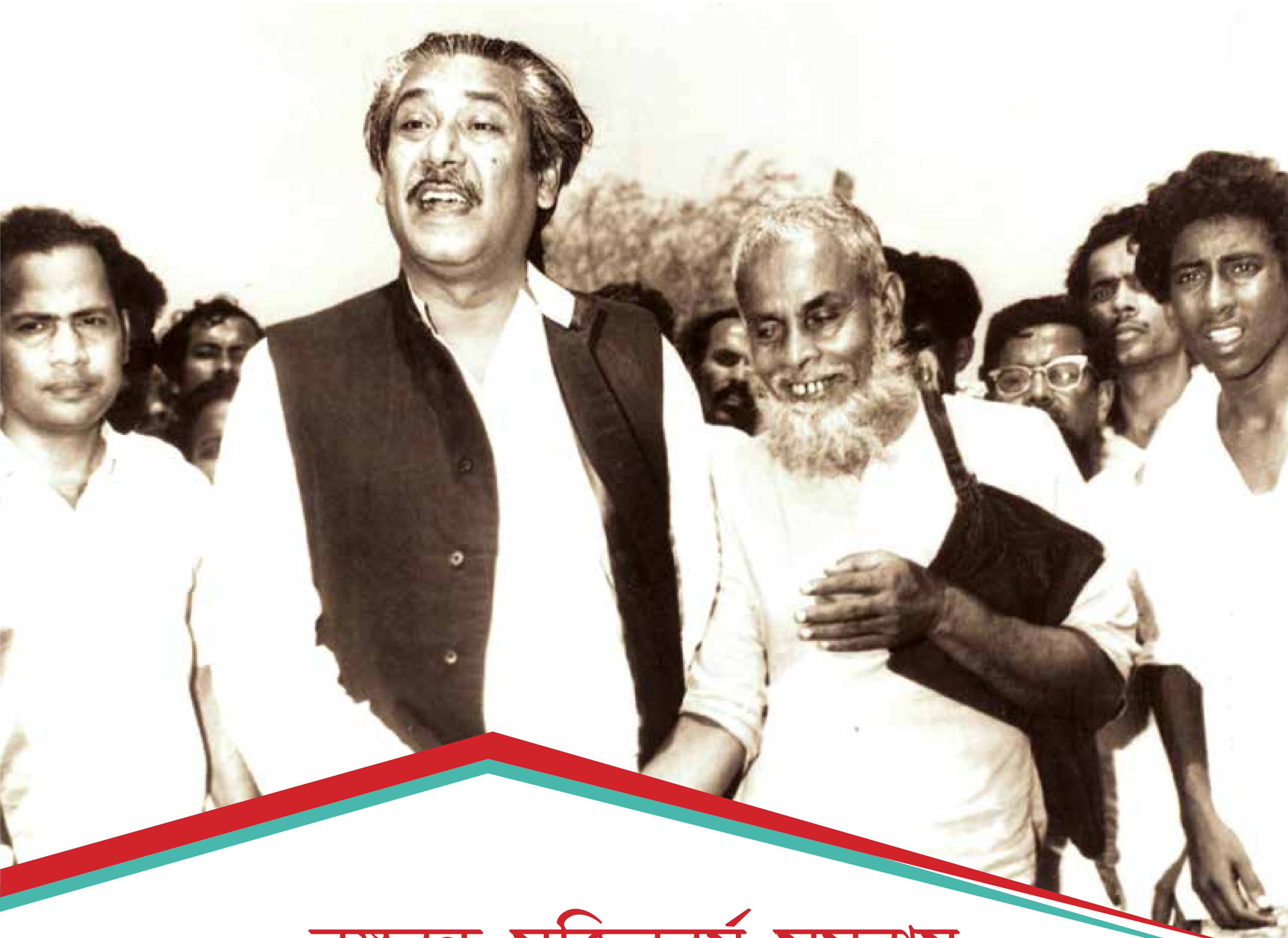

বঙ্গবন্ধু-মুজিববর্ষ-সমবায়

ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক-এটি যেমন সত্য; তেমনি সত্য বঙ্গবন্ধুর জনসম্পৃক্ত উন্নয়ন ভাবনা। বঙ্গবন্ধুর এই জনগণমুখী উন্নয়ন ভাবনায় আমরা সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখতে পাই। ২০২০-২০২১ সালে পালিত হচ্ছে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী আমাদের জন্য অনন্য তাৎপর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এই অসাধারণ ঘটনার মেলবন্ধনে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন নতুন মাত্রা পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। জাতির পিতা সমবায় আন্দোলনকে সোনার বাংলা বিনির্মাণের হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতেই আমরা জাতির পিতার সমবায় দর্শনকে পাথেয় করে সমবায় আন্দোলনকে ব্র্যান্ডিং করার মাধ্যমে নতুন যুগের সমবায় চেতনার ও কর্মযজ্ঞের সূচনা করতে পারি। জাতির পিতার রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কর্মযজ্ঞকে বাস্তবায়ন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহান প্রয়াসে সমবায় একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হবে-এ প্রত্যাশায়ই আমাদের কর্মযজ্ঞ পাথেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে আমরা পেয়েছি ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ স্লোগান। আমরা বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিতে সমবায় ও

এর প্রাসঙ্গিকতা, বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের দ্যোতনা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের কার্যকর প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়োগিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে 'সমবায় আন্দোলন'কে জাতির পিতার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' দর্শনকে 'জাতির পিতার সমবায় বাংলা'য় কার্যকর করতে পারি। আর তাহলেই বাংলাদেশের উন্নয়ন মহাযজ্ঞে 'সমবায় আন্দোলন'কে সম্পৃক্ত করে জাতির পিতার প্রতি প্রকৃত সম্মান জানানো হবে।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনায় সমবায়

১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু গভীর আবেগে বলেছিলেন 'আমি বাঙালি জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসেবে দেখতে চাই না। আমি চাই তারা আত্মমর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এজন্যে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে।' আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনদর্শন ছিল এদেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philosophy towards people's wellbeing)। বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের ভিত্তিমূল হলো একটি ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে (only people can make history) অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মুক্তি-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন দর্শন যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ। যার ধারাবাহিকতায় একটি মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো 'গণপ্রজাতন্ত্রী' বাংলাদেশ যেখানে সাংবিধানিকভাবেই 'প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক জনগণ' [বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭(১)]। সাধারণ জনগণকে কেন্দ্রে রেখেই তাই বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন পরিচালিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কাদের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন? তাঁদের জন্য—যাদের কথা কেউ ভাবেনি কেউ ভাবে না। তারা হলো—(১) অবহেলিত; (২) নির্যাতিত; (৩) নিপীড়িত; (৪) বঞ্চিত; (৫) দরিদ্র; (৬) ভুখা-নাঙ্গা; (৭) নিষ্পেষিত; (৮) অবদমিত; (৯) অচল; (১০) সাধারণ; (১১) অভাজন; (১২) ভীত ও কুণ্ঠিত; (১৩) অসহায়-সম্বলহীন; (১৪) স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাওয়া; (১৫) মুক্তিকামী জনগণ।

বঙ্গবন্ধু উন্নয়নকে দেখেছিলেন একটা অখণ্ড সমগ্র বিষয় হিসেবে। তাঁর কাছে উন্নয়ন মানে কেবল সম্পদ অর্জন কিংবা মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি নয়। তিনি উন্নয়ন বলতে বুঝতেন সার্বিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক প্রগতি, শিক্ষার ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার উদ্বোধন, নেতৃত্বের বিকাশ, আত্মরক্ষার ক্ষমতা, দুর্নীতিমুক্ত সংস্কৃতি, শোষণহীন বিকাশ, জাতীয় ঐক্য এসবের সম্মিলিত অগ্রসর অবস্থা। আজকাল যেসব বিষয়কে উন্নয়নের সামাজিক সূচক বা সোস্যাল ইন্ডিকেটর বলা হয়, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনে সেসব তখনই অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিরঙ্কুশ পুঁজিবাদ ব্যক্তির প্রকট মুনাফাবাজীকে অনুমোদন দেয়, উৎসাহিত করে, প্রণোদিত করে; অবধারিতভাবেই শোষিত-বঞ্চিত হয় শ্রমিক ও ভোক্তা নিম্নশ্রেণির মানুষ। অন্যদিকে নিরঙ্কুশ সমাজতন্ত্র ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ, সৃজনশীলতার চর্চা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারকে হরণ করে রাখে। নিরঙ্কুশ পুঁজিবাদ কিংবা নিরঙ্কুশ সমাজতন্ত্র কোনো ব্যবস্থাই নির্ভেজাল আদর্শ জীবনপ্রণালি নয়। বঙ্গবন্ধু এই দুয়ের মাঝামাঝি একটা মিশ্র প্রকৃতির আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন চেয়েছিলেন, তার রূপরেখা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এমন অনন্য উন্নয়ন দর্শনের সহযোগী পদ্ধতি ছিল সমবায়। বঙ্গবন্ধু তাই সমবায়কে উন্নয়নের প্রধানতম পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পুনশ্চ উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু সনাতন সমবায় পদ্ধতির মধ্যেও কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন যাতে করে তা শোষিতের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অধিকতর সহায়ক হতে পারে। তিনি সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন,

কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল-ভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয়, তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভুয়া সমবায় কোনোমতে সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন, কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন, সমবায় সংস্থাগুলোকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির ওপর নয়।[১]

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে সমবায়ের অবস্থান

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের উত্তাল সময়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় সমবায়

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু উত্তাল সময়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে মূলত স্বাধীন সত্তায় রূপায়িত করেন। এ সময় দেশের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং মুক্তিসংগ্রামকে কার্যকরভাবে সফল করার জন্য বঙ্গবন্ধু জনগণের উদ্দেশ্যে ৩৫টি নির্দেশনা জারি করেন। এ নির্দেশনায় বঙ্গবন্ধু আহবান জানান :

আজ সমগ্র দেশবাসী তাঁদের সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ; তারা জানাচ্ছেন, সামরিক শাসনের কাছে তারা নতি স্বীকার করবেন না। অতএব আমি সকলের কাছে আবেদন জানাই, বিশেষ করে যাদের কাছে সর্বশেষ সামরিক হুকুম জারি করা হয়েছে, তাঁরা যেন ভীতি প্রদর্শনের কাছে নত না হন। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের পেছনে রয়েছে। আমি বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের সকল কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সমাধানের উদ্দেশ্যে পঁয়ত্রিশটি নির্দেশনামা জারি করছি। প্রত্যেককে এই নির্দেশগুলো মেনে চলতে হবে। কেউ একে অমান্য করতে পারবে না; করলে শাস্তি পেতে হবে।[২]

দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় ১৫ মার্চ ১৯৭১ সালের সংখ্যা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নতুন কর্মসূচি ঘোষণার কথা জানা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৩৯ থেকে ৭৪৬ নং পৃষ্ঠায় আমরা এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাই। হয়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক জারিকৃত পয়ত্রিশটি নির্দেশনায় সারাদেশকে অচল করে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম খোলা বা চালু থাকবে এবং কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম বন্ধ থাকবে তা এসব নির্দেশনায় সুস্পষ্ট করা হয়েছিল। জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান/অফিস বা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। ৩৫টি নির্দেশনামার একটি নির্দেশনামা ছিল সমবায় বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু রাখার জন্য।

৩৫টি নির্দেশনার ১৬ নম্বর নির্দেশনার (ঘ) নং দফার সমবায় প্রতিষ্ঠান বিষয়ক নির্দেশনাটি ছিল নিম্নরূপ :

১৬(ঘ) : পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও তার অঙ্গ সংস্থাগুলো থানা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলো থেকে কৃষিঋণ দেয়া অব্যাহত থাকবে।[৩]

মুক্তিযুদ্ধকালীন যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সিলেবাসে সমবায়ের উপস্থিতি

মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকেরা ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশের সামগ্রিক একটি রূপরেখা নিয়ে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন।

তারা মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন সময়ে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম ও টিকে থাকা এবং গ্রামকে স্বয়ম্ভর করার জন্য যুব প্রশিক্ষণের আয়োজন করতেন। যুব প্রশিক্ষণের ছিল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সিলেবাস। বাংলাদেশ সরকারের Youth Camp এসব যুব প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি ও সিলেবাস (YOUTH TRAINING PROGRAMME, SYLLABUS AND ROUTINE; Issued by Youth Camp Board of Control) প্রণয়ন ও পরিচালনা করতেন। এ ধরনের প্রশিক্ষণ নির্দেশনা বুকলেটের ৬৭বি দফায় আমরা সমবায়ের উপস্থিতি পাই এভাবে :

YOUTH TRAINING
PROGRAMME, SYLLABUS AND ROUTINE
৬৭.B. FUNCTIONS
১(c) : Revive owner- labourer production sharing practice to intensify cooperative labour in all fields.
১(d) : Maximise food production by cooperative labour in the utilization of all land, water, vegetable and animal resources of the village.[৪]

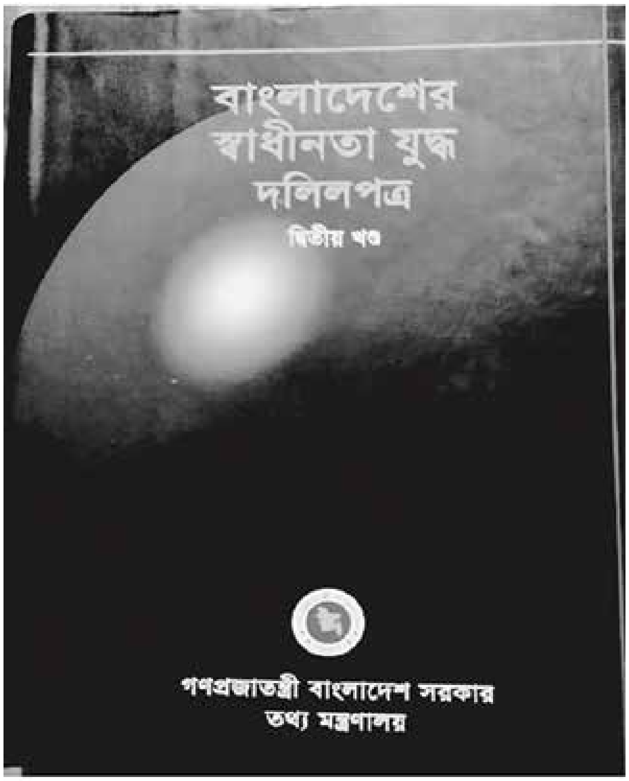

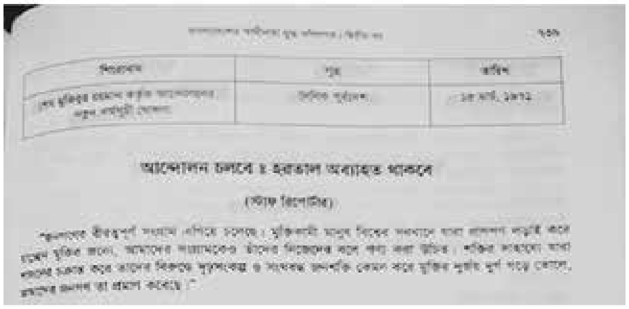

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
[illegible]	[illegible]	[illegible]

আন্দোলন চলবে ঃ হরতাল অব্যাহত থাকবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

এ যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সিলেবাসে আমরা 'স্বাধীন বাংলা সরকার অনুমোদিত গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠামো' শিরোনামে প্রশিক্ষণ প্রেসনোট দেখতে পাই। গ্রাম পঞ্চায়েত কাঠামোর আর্থ-সামাজিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষে এ রিসোর্স নোটের 'কার্যক্রম' ও অর্থব্যবস্থা' অনুচ্ছেদে আমরা 'সমবায়'-এর উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখতে পাই এভাবে :

কার্যক্রম :
এ শিরোনামে ৫টি দফা রয়েছে। এর ১ ও ৫ নম্বর দফায় আমরা সমবায়-এর উপস্থিতি এভাবে পাই :
(১) গ্রামের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তোলার সকল কাজে, বিশেষত দুর্ভিক্ষ এবং অরাজকতা দমনের কাজে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা গ্রামবাসীর সকল সম্ভাব্য পরিশ্রম এবং সমবায় যতদূর সম্ভব বাড়াতে হবে।
(৫) গ্রামবাসীর সাধ্যমতো পরিশ্রম এবং সমবায়ের সাথে সাথে কৃষি এবং কুটিরশিল্পের সকল ক্ষেত্রে গ্রামে আর কী কী উৎপাদন হতে পারে এবং গ্রামের উৎপাদন দিয়েই কী করে বাইরে থেকে আসা জিনিসের কাজ চলতে পারে সেই উদ্ভাবনা শক্তিও বাড়াতে হবে। যেকোনো বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে শুধু খাদ্য এবং সমাজ-শৃঙ্খলাতেই নয়, বস্ত্র, আবাস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামের পথঘাট, শরীরচর্চা এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক কৃষ্টির সকল ক্ষেত্রেই অদম্য মনোবলে আত্মনির্ভরশীল গ্রামের জীবনযাপন সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়।[৫]

অর্থব্যবস্থা :
শ্রম-সমবায় এবং ভাগাভাগি-বিনিময় ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত গ্রাম জীবনে টাকা পয়সার তেমন কোনো প্রয়োজন থাকবে না। দুর্নীতি এবং সামাজিক প্রতারণার বাহন হিসেবে টাকার ব্যবহার যত কমবে ততই মঙ্গল।[৬]

সমবায় ভিত্তিতে চাষ করার জন্য বঙ্গবন্ধুর আহবান
বঙ্গবন্ধু সমবায় আন্দোলনকে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করতেন। স্বাধীনতার পরপরই তিনি এ বিষয়ে জনগণকে তৎপর হওয়ার জন্য আহবান জানান। এ ধরনের একটি আহবান সংবলিত প্রতিবেদন আমরা দৈনিক বাংলার ২ এপ্রিল ১৯৭২ সংখ্যায় পাই। পত্রিকার প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ :

সমবায় ভিত্তিতে চাষ করুন : যশোরে জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু।
দেশের সব সম্পদ এখন জনগণের-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পহেলা এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাধিক পরিমাণ জমি চাষের অধীনে আনার জন্য সমবায় ভিত্তিতে কৃষিকাজ করা ও কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আজ কৃষকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। দুইদিনব্যাপী খুলনা সফরের পরে আজ ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে যশোর বিমানবন্দরে উপস্থিত সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, সমস্ত সম্পদ এখন জনগণের। জাতীয়করণসহ বৈপ্লবিক পদক্ষেপের মাধ্যমে শোষণের মূল উৎপাটিত হয়েছে। কৃষকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন যে তারা যেন সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ শুরু করে দেয়। তিনি বলেন পাকিস্তানি বর্বর কিছু রেখে যায়নি এবং কর ও খাজনা মওকুফ করার কারণে সরকারের আয় কমে গেছে। সুতরাং সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে তারা যেন অবিলম্বে তাদের কাজ শুরু করে দেয়।[৭]

সমবায় ভিত্তিতে চাষ করুন ঃ যশোরে জনতার উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু

দেশের সব সম্পদ এখন জনগণের

যশোর, ১লা এপ্রিল (বাসস) —প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সর্বাধিক পরিমাণ জমি চাষাধীনে আনার জন্য সমবায় ভিত্তিতে কৃষিকাজ করা ও কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আজ কৃষকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

সরকারের মুখাপেক্ষী হবেন না

সমবায় আন্দোলন জোরদারকরণে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় অবস্থান

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সমবায়মনস্ক ও সমবায় বিশ্বাসী একজন উন্নয়ন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি সবসময় বিশ্বাস করতেন সমষ্টিগত শক্তির প্রকাশক 'সমবায়' তাঁর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' নির্মাণের একটি অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে। তাই তিনি সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন। এ ধরনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ট্রিবিউন পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে। প্রতিবেদন থেকে আমরা নিম্নোক্ত বিবরণ পাই :

সমবায় আন্দোলন জোরদার করাই সরকারের নীতি : বঙ্গবন্ধু

কুমিল্লার এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সমবায় আন্দোলন জোরদার করাই তার সরকারের নীতি। তিনি সেটা করতে সব ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষিদের স্বার্থ রক্ষা এবং জনগণকে সমবায় পদ্ধতি গড়ে তোলার আহ্বানও জানান।

১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে কুমিল্লায় দুই দিনব্যাপী এক সভায় চাষাবাদ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর শুভেচ্ছা বাণীতে আরও বলেন, 'দেশে সমবায় আন্দোলনকে ব্যাপক ভিত্তিতে প্রসারিত করা হচ্ছে। ২৬ এপ্রিলের পত্রিকায় এ সম্পর্কিত খবর প্রকাশ করা হয়। সেই সংবাদে বলা হয়, সরকারের নীতি অনুযায়ী অবিলম্বে একটি গ্রহণযোগ্য কর্মসূচি নেওয়ার বিষয়েও বঙ্গবন্ধু গুরুত্বারোপ করেন। স্বায়ত্তশাসন, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী শামসুল হক আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন। সমবায় আন্দোলন হচ্ছে সাধারণ মানুষেরই একটা আন্দোলন,বঙ্গবন্ধুর এই উক্তি সম্পর্কে পল্লি উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী শামসুল হক বলেন, 'এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কে একটি পাঁচশালা পরিকল্পনা পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় দফতর তৈরি করেছে। ১৯৭৬-৭৭ সালের মধ্যে পল্লি শিল্পের বিশেষ করে মৎস্য, লবণ, ডেইরি শিল্পগুলো থানা পর্যায় পর্যন্ত সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে জানা যায়।[৮]

মহিলা সমবায়ী প্রীতি রাণী দাশকে বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে লেখা চিঠি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২১ নভেম্বর সিলেট সদর উপজেলাধীন কৌড়িয়া পল্লী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর তৎকালীন সম্পাদক প্রীতি রাণী দাশকে নিজ হাতে একটি পত্র লেখেন। উল্লেখ্য, প্রীতি রাণী দাশ জাতির পিতাকে কৌড়িয়া পল্লী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যদের তৈরি তাঁতের কাপড় উপহার দেন। উপহার পেয়ে জাতির পিতা ভীষণ খুশী হন এবং তিনি নিজ হাতে সমিতির সম্পাদককে চিঠি লেখেন। এ চিঠিতে দেশের উন্নয়নে নারীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন এবং নারী উন্নয়নে তাঁর সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন। আমরা জাতির পিতার নিজ হাতে লেখা

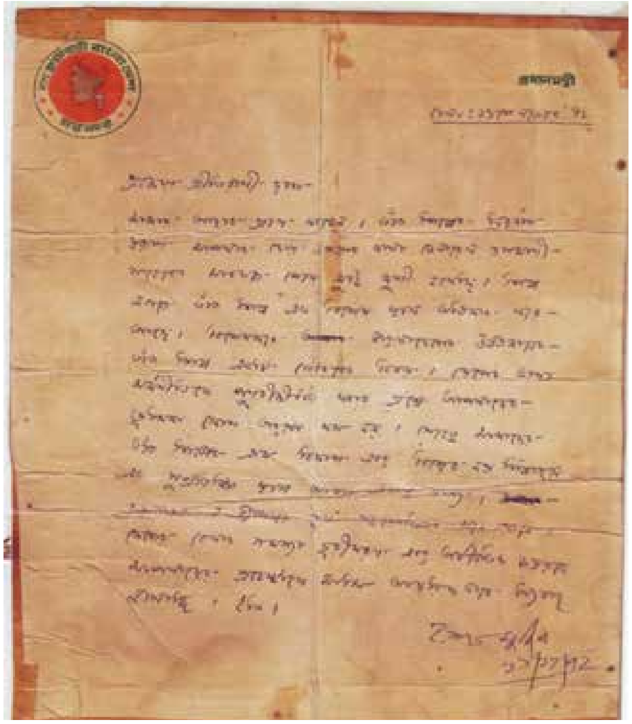

চিঠিটি এখানে তুলে ধরছি[৯] :

> প্রধানমন্ত্রী
> ঢাকা : ২১ শে নভেম্বর' ৭২
>
> শ্রদ্ধেয়া প্রীতি রাণী দাশ
> আমার আদাব গ্রহণ করবেন। তাঁত শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ আপনার দেওয়া উপহারখানা জেনারেল ওসমানী সাহেবের মারফতে পেয়ে খুবই খুশী হয়েছি। শিল্প জগতে তাঁত শিল্প এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের উন্নতমানের তাঁত শিল্প একটি গৌরবের বিষয়। দেশের ভাঙ্গা অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রশ্নে আপনাদের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। সেহেতু আপনাদের তাঁত শিল্পের ক্রম বিকাশ এবং বিশ্বের হস্তশিল্পাঙ্গনে এর সুপ্রতিষ্ঠিত স্থান আমার একান্ত কাম্য। সরকার এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাবে। দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনাদের প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
> ইতি
>
> শেখ মুজিব
> ২১/১১/৭২

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও গ্রামভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে। উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন—

> ...বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচকানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।
> আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গতে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যান্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।[১০]

দেশজ উন্নয়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভাবনা। কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পকে তিনি সমবায় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বেতার টেলিভিশন ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা। তিনি বলেন 'ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সূতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাঁদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণ দানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।' ছোট ছোট চাষিদের কথাও তিনি বিস্মৃত হননি। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষ্যে বেতার-টেলিভিশনে ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'ছোট ছোট চাষিদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এ কথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষিরা কেবলমাত্র আধুনিক ব্যবস্থার সুফলই পাবে না বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজশর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে।'

বঙ্গবন্ধু জানতেন শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাও সুসংহত করতে হবে। প্রয়োজন রয়েছে সুষম বন্টন ও সরবাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রেও তিনি সমবায় ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস নেন। ১ মে ১৯৭২ সালে শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যি জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে তিনি তাই বলেন—

> আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেছি। পাশাপাশি দুঃখী জনগণের অভাব মোচন ও দুর্দশা লাঘবের জন্য আমাদের সাধ্যমত আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদনকে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নির্যাতনমূলক ইজারাদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার প্রায় ষোল কোটি টাকার টেষ্ট রিলিফ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছে। দরিদ্র চাষিদের দশ কোটি টাকার তাকাবি ঋণ, এক লক্ষ নব্বই হাজার টন সার, দু'লাখ মণ বীজ ধান দেওয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে চার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। তিনি আরো বলেন 'আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতোমধ্যেই বেসরকারি ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স-পারমিট বাতিল করে দেয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে।[১১]

বঙ্গবন্ধু সমবায়কে দেখতেন নতুন সমাজ-আদর্শ সমাজ-দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে। তিনি দুর্নীতির কথা জানতেন-দুর্নীতিবাজদের কথা জানতেন-সমাজের পচনের কথা উপলব্ধি করতেন। এর থেকে মুক্তির জন্য তিনি সমবায় পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাইতো ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বলেছিলেন—

> আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্লাক মার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। ...সমাজব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে

চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে।...আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ এদিন থাকবে না।...আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে।[১২]

বঙ্গবন্ধু বাংলার উন্নয়নে গ্রামে গ্রামে গ্রাম সমবায় গড়তে চেয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের সোপান রচনা করতে চেয়েছিলেন গ্রাম সমবায়ের সফল বাস্তবায়নের দ্বারা। গ্রাম সমবায় গঠনের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ বিষয়ে তার ছিল স্পষ্ট দর্শন ও মনোভাব। গ্রাম সমবায়ের রূপরেখা তিনি স্পষ্টভাবে এঁকেছিলেন। এ বিষয়ে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমরা তাঁর বক্তব্য থেকেই পাই :

কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালী কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, থাক। ওটা চলুক। আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ।...কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাদের কাজ করে শিখতে হবে। সেই জন্য আমার কো-অপারেটিভ। যদি কাজ করে শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল করুন।[১৩]

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এবং দ্বিতীয় বিপ্লব-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। একে তিনি This is our second revolution বা 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন।[১৪] ১৯৭৫ সালের ৬ জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার পক্ষের অন্যান্য রাজনৈতিক দল, শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা প্রমুখকে নিয়ে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, সংক্ষেপে বাকশাল নামে একটি জাতীয় দল গঠন করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সর্বোচ্চ জাতীয় ঐক্য অর্জন। এ জাতীয় দলের ১৫টি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ :

ছয় : সর্বাঙ্গীণ গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও ক্রমান্বয়ে যান্ত্রিকীকরণ এবং সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ প্রচলন।[১৫]

দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে দুটি দিক ছিল—(ক) সরকার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্মসূচি এবং (খ) আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি।

(ক) প্রথমত ছিল সরকার-পদ্ধতির পরিবর্তন, একটি জাতীয় দল গঠন, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করা, জেলা প্রশাসনের দায়িত্বে জনগণের প্রতিনিধি বা গভর্নর, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার এবং

(খ) দ্বিতীয়ত সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও ভূমিব্যবস্থাপনা, গ্রামে মাল্টিপারপাস বা বহুমুখী কো-অপারেটিভস, পল্লী অঞ্চলে 'হেলথ কমপ্লেক্স' প্রতিষ্ঠা, পরিকল্পিত পরিবার এবং শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি।[১৬]

উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচিতে ৫টি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। এগুলো হলো : দুর্নীতি উচ্ছেদ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এবং জাতীয় ঐক্য।[১৭]

দ্বিতীয় বিপ্লবের আওতায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছিলেন যার অন্যতম ছিল সমবায় পদ্ধতির চাষাবাদ। এসব পদক্ষেপগুলো হলো :

১. জমির সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ;
২. প্রতিটি থানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ;
৩. পর্যায়ক্রমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ;
৪. কৃষকদের নিকট ফার্টিলাইজার পৌঁছানো;
৫. খাল কেটে কৃষি জমিতে চাষের ব্যবস্থা। পাম্প সরবরাহ না করা পর্যন্ত বাঁধ দিয়ে পানি আটকিয়ে কিংবা কুয়া কেটে সেখান থেকে কৃষিকার্যে পানির ব্যবস্থা করা;
৬. কৃষির ক্রমান্বয়ে যান্ত্রিকীকরণ এবং কৃষি ও শিল্পের প্রসার। উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় কৃষক ও শ্রমিকের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা;
৭. সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ। জমির মালিকানা থাকবে এবং কিছুতেই নেওয়া হবে না, বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট তা জানিয়ে দেন। উৎপাদিত ফসলের এক অংশ জমির মালিক, একভাগ কৃষক ও এক অংশ সরকার পাবে। সমবায় হবে কম্পালসারি;
৮. গ্রামে গ্রামে ৫০০ থেকে ১০০০ পরিবার নিয়ে মাল্টিপারপাস ভিলেজ কো-অপারেটিভ, ৬৫ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে ৫ বছরে ১টি করে এরূপ বহুমুখী সমবায় স্থাপন। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি কর্মক্ষম মানুষ এর সদস্য হবে। সরকারের কাছ থেকে অর্থ, ফার্টিলাইজার, টেস্ট রিলিফের বরাদ্দ, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের বরাদ্দ তাদের কাছে যাবে। কৃষি সমবায়ের মতো এর উৎপাদিত পণ্যও জমির মালিক, কো-অপারেটিভের সদস্য ও সরকারের মধ্যে বণ্টিত হবে।এর পর বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য,'আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলে যারা টাউট আছে, তাদেরকে বিদায় দেওয়া হবে।'[১৮]

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালের বাজেটে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯৭৩-'৭৪ অর্থবছরে বেশকিছু অগ্রগতি সাধিত হয়। এর মধ্যে সমবায় সেক্টরের অর্জন ছিল নিম্নরূপ :

১. ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা তাকাভি ঋণ কৃষি ব্যাংক ও সমবায়ের মাধ্যমে ১৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হয়।
২. পাবনা ও ঢাকার সমবায় দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রের একত্রীকরণ ও সম্প্রসারণের অগ্রগতি সমবায় কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিচিত হয়।[১৯]

বঙ্গবন্ধু এমন সমবায়ের কথা ভেবেছেন যা গ্রামের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করবে, শুধু কৃষি- উৎপাদনের সঙ্গে জড়িতের নয়। সে কারণেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় ছিল 'বহুমুখী' সমবায়। বিভিন্নমুখী তৎপরতা পরিচালনাও এসব সমবায়ের লক্ষ্য ছিল। তিনি গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় তথা গ্রামের বাইরের সব সম্পদও গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে প্রবাহিত করার কথা ভেবেছেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত সমবায়ী গ্রাম প্রস্তাবের পেছনে একদিকে ছিল বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং অন্যদিকে ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষ্যনীয়। বঙ্গবন্ধু নিজে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন এবং বঙ্গবন্ধুর সময়কালে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাজতন্ত্রের যে মডেল বিরাজমান ছিল, তাতে কৃষিতে যৌথ চাষভিত্তিক সমবায়কেই যথাযথ বলে বিবেচনা করা হতো। দ্বিতীয় বিপ্লব এবং তার অংশ হিসেবে সমবায়ী গ্রাম কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব বিবেচনা থেকেই বের করেছিলেন।

গ্রামের বিপুল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে একমাত্র সমবায়কে অবলম্বন হিসেবে বঙ্গবন্ধু চিহ্নিত করেন। তিনি দরিদ্র ও অশিক্ষিতদের উন্নয়নের স্বপ্ন বিনির্মাণে সমবায়ের শক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার কথা

বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু দেখান, সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে অনেকের পুঁজির সমন্বয়ে বৃহৎ বিনিয়োগ সম্ভব, যা সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত পুঁজির স্বার্থান্বেষী চক্র, দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট, দেশি বিদেশি চক্র 'দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের' বঙ্গবন্ধুর তত্ত্ব বাস্তবায়ন হতে দেয়নি। তা নাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জনগণের জীবনমান আজ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে গর্বের সঙ্গে প্রতিযোহিতা করতো।

বঙ্গবন্ধুর 'সমতাবাদী বহুমুখী সমবায় গ্রাম' এর রূপরেখা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী মহাচিন্তক। তিনি সময়ের অগ্রগামী পুরুষ ছিলেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমরা অবাক বিস্ময়ে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা উপলব্ধি করতে পারি। বর্তমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত খাদ্য চাহিদা, কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, অব্যবহৃত পতিত কৃষিজমি উৎপাদনের বাইরে পড়ে থাকা-এসব সমস্যার কথা আগেই বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধু 'গ্রাম সমবায় সমিতি'র পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বর্তমানের অনেক সমস্যার উদ্ভব হতো না বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

গ্রামের আর্থ-সামাজিক চিত্রে আমূল পরিবর্তন আনাই ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্যাস। আধা সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার অবসান বা কৃষিক্ষেত্রে শোষণকে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য, সকল কর্মক্ষম গ্রামীণ জনতার সমবেত শ্রমশক্তিকে উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োজিত করে এবং উৎপাদন উপকরণসমূহকে পূর্ণভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত করে গ্রামবাংলার দরিদ্র দিন দুঃখী শোষিত কৃষক জনতার মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ''বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায়'' কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল :

১. পাঁচশত থেকে এক হাজার পরিবার সমন্বয়ে গ্রাম সমবায় গঠন।
২. এই সমস্ত পরিবারের সমস্ত কৃষিজমি সমবায়ের অধীনে ন্যস্তকরণ।
৩. প্রতিটি গ্রাম সমবায় পরিচালনার জন্য সমবায় সভ্যদের ভোটে একটি নির্বাচিত পরিষদ গঠন। (প্রত্যেক কর্মক্ষম ভূমিহীন কৃষক-মজদুর, মালিক-কৃষক বাধ্যতামূলক সমবায়ের সভ্য হবে।)
৪. মালিক-কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক-মজদুর সমবায়ের কাজের জন্য নগদ পারিশ্রমিক পাবেন।
৫. সমবায় ক্ষেত খামারে ও অন্যান্যভাবে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে ভাগ করে ভূমি মালিক, ভূমিহীন কৃষক-মজদুর বা সমবায় ও সরকারের মধ্যে বিতরণ। (সরকারের প্রাপ্য অংশ স্থানীয় ধর্মগোলায় রাখতে হবে);
৬. সরকার সমবায়ের কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যাবতীয় উপকরণ বা সাজসরঞ্জাম স্বল্পমূল্যে বা ঋণে বা বিনামূল্যে সমবায়কে প্রদান করবে।
৭. সমবায় সভ্যদের যৌথ চাঁদা বা শেয়ারে গঠিত মূলধনে এবং সরকারের মূলধন ও ঋণে প্রতিটি সমবায়ের অধীনে নানান কুটিরশিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।
৮. সরকার ধর্মগোলায় রক্ষিত সম্পদের মধ্য থেকে একটি অংশ নিয়ে নেবে, বাকি অংশ সমবায়ের নানান দুর্যোগ ও প্রয়োজন মোকাবেলার জন্য জমা থাকবে।
৯. সরকার গ্রাম সমবায় এলাকার আইনশৃঙ্খলা, রাস্তাঘাট, অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, সেচ, সার, বীজ,কীটনাশক ওষুধ, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ করবে।
১০. সমবায় তার সভ্যদের প্রদানকৃত শেয়ার মূলধন ও সরকারের ঋণ বা অংশগ্রহণের ভিত্তিতে যেকোনো ব্যবসা-বাণিজ্য ও ছোটখাটো কলকারখানা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারবে।
১১. প্রতিটি গ্রাম সমবায় উৎপাদন ও প্রশাসনিক ইউনিটরূপে গড়ে উঠবে।
১২. প্রতিটি গ্রাম সমবায় সমন্বয়ে একটি করে 'আঞ্চলিক সমবায় কার্যালয়' গড়ে উঠতে পারে তবে থানা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে গ্রাম সমবায়সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। (ক) আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তারা গ্রাম সমবায়ের পরিচালনা পরিষদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। তবে উভয় কার্যালয়ে সরকারের তরফ থেকে একজন ও জাতীয় দলের থেকে একজন প্রতিনিধি সার্বক্ষণিকভাবে পরিদর্শক হিসেবে থাকবেন। তবে এদের ভোটাধিকার থাকবে না। (খ) মূলত প্রতিটি গ্রাম সমবায় স্থানীয়ভাবে 'সমবায় সরকার' হিসেবে পরিগণিত হবে। সমবায়ের যাবতীয় নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব সমবায় সরবারের উপর ন্যস্ত থাকবে। (গ) সমবায় তথা বিভিন্ন সমবায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিবাদ মীমাংসার জন্য আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'সমবায় ট্রাইবুনাল' গঠিত হবে।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলনের বর্তমান উপযোগিতা

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত 'বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায়' কর্মসূচি ছিল একটি যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এটি ছিল একটি সময় উপযোগী (Time Driven), চাহিদা উপযোগী (Demand Driven) ও পরিস্থিতি বা আবহ উপযোগিতার (Situation Driven) নিরিখে উন্নয়নমুখী ও জনমুখী (Pro- development and Pro- people) চিন্তার আলোকে জনবান্ধব ((Pro- people) কর্মযজ্ঞ। উক্ত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন আসতো। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য যেসব ইতিবাচক ফলাফল আমরা পেতে পারতাম তার কয়েকটি হলো :

(ক) গ্রাম সমবায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে সমবায় এলাকার সকল কৃষিজমি সমবায়ের ওপর ন্যস্ত হতো। সমবায় এলাকার সকল সাবালক কৃষক-কৃষাণি সমবায়ের সদস্য হতে পারতো এবং সকলে মিলে চাষাবাদ করতো। এ পদ্ধতিতে বর্গা প্রথা, মজদুর প্রথা উঠে যেত।
(খ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম প্রদানের জন্য সকলকে একদিকে যেমন পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, অপরদিকে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে জমির মালিকবৃন্দ, কৃষি শ্রমিক বা ভূমিহীন ও সমবায় বা সরকারের মাঝে সমানভাগে ভাগ করা হতো। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব শুরু হতো এবং এর ফলে ব্যাপক জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হতো।
(গ) ফসলের উদ্বৃত্তাংশ বিদেশে রপ্তানি করে কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করে দেশকে শিল্পায়িত করা সহজতর হতো।
(ঘ) দেশ অনেক আগেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো।
(ঙ) বিধিবদ্ধ পুঁজিতে বেসরকারি উদ্যোগে বা ব্যক্তিমালিকানায় ছোটোখাটো শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদান করা হতো।
(চ) ব্যক্তিমালিকানা যাতে তাদের শ্রমিকবৃন্দ ও দ্রব্যসামগ্রীর ক্রেতা সাধারণকে শোষণ করতে না পারে, সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো।
(ছ) গ্রাম সমবায়ই হতো প্রশাসনের প্রাথমিক ও মূলভিত্তি।
(জ) গ্রাম সমবায়ের সার্বিক ক্ষমতা থাকত জনসাধারণের ওপর। এর ফলে নেতৃত্বের বিকাশসহ জনগণের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হতো।
(ঝ) ভূমির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার হতো। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ত।
(ঞ) শুধু উৎপাদন নয়; বরং বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়ও ইতিবাচক এবং গুণগত পরিবর্তন আসত।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে করণীয়

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' কোনো কল্পনা নয়-চরম বাস্তবতা। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিল-২০১৯ অনুসারে- ২০১৯ সালে বিশ্বের ৪১তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ।

২০১৮ সালে ছিল ৪৩ তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এশিয়ার অন্য অনেক দেশের মতো আগামী ১৫ বছরে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে বাংলাদেশের। গত এক বছরে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিলের ৪৩তম অবস্থান থেকে ৪১তম অবস্থানে উঠে এসেছে। আগামী ১৫ বছরে বাংলাদেশ ১৯ ধাপ এগিয়ে যাবে। সে হিসেবে ২০২৩ সালে ৩৬তম অবস্থানে, ২০১৮ সালে ২৭ তম অবস্থানে এবং ২০৩৩ সালে ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সমবায় অধিদপ্তরও সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে নবতর চেতনায় এগিয়ে যাচ্ছে মুজিববর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে। সময় (Time driven), চাহিদা (Demand driven) ও প্রয়োজনের নিরিখে (Situation driven) সরকারও সমবায় ভাবনাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে তৎপর এবং এক্ষেত্রে দুটি কাজ জরুরি ভিত্তিতে প্রণিধানযোগ্য :

১. সমবায়কে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শভিত্তিক সনাতনি সংগঠন না করে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই যাতে নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
২. বাংলাদেশের সমবায় স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আশীর্বাদ গ্রহণ ও ব্যবহার করে যাতে বাংলাদেশের জনগণের সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

করোনাকালে অনেক হতাশার মাঝেও আমরা কিছু সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত দেখতে পাচ্ছি। সমবায় সেক্টরেও এ সম্ভাবনার ছোঁয়া স্পর্শ করতে পারে। এজন্য কিছু করণীয় আমরা এভাবে উপস্থাপন করতে পারি :

১. সমবায় সেক্টরে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা ও পণ্য পৌঁছানো যেতে পারে।
২. সমবায়ীদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশেষায়িত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তোলা যেতে পারে।
৩. 'আন্তঃসমবায় সহযোগিতা'র সমবায় মূলনীতির বাস্তবায়ন করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমবায়ীদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এনে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার লিংকেজ গড়ে তোলা যেতে পারে।
৪. নতুন নতুন ক্ষেত্রে (যেমন : গার্মেন্টস সেক্টর, পতিত জমিতে কৃষি উৎপাদন, স্কুল কো-অপারেটিভ, ট্যুরিজম কো-অপারেটিভ হেলথ কো-অপারেটিভ ইত্যাদি) সমবায়কে নতুন আঙ্গিকে সম্প্রসারণ করে এর প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটানো যেতে পারে।

মুজিববর্ষে আমাদের সমবায় অঙ্গীকার

১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, '...সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না-চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।'

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে সমবায় অধিদপ্তর বর্তমানে বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত এই 'আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি'র মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে আছে জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় অঙ্গীকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি. তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেছেন :

> সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল। (সমবায় বার্তা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংখ্যা)।

আমরা সমবায় আন্দোলনকে জাতির পিতার সমবায় দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় অঙ্গীকারকে পাথেয় করে বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী পরীক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে আমরা সমবায়কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করে আমাদের কথা-কাজ ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে চাই :

> সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন।
> (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators).

জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও উন্নয়ন সারাংশ এখানেই নিহিত রয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তথ্যসূত্র :

১. বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : প্রয়োগ অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা, হরিদাস ঠাকুর, গতিয়া প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০২১; পৃষ্ঠা নং-৫
২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, সম্পাদনায় : ড. এ এইচ খান, দ্বিতীয় খণ্ড, একাত্তর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮, পৃষ্ঠা নং-২৯
৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : হাসান হাফিজুর রহমান, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা,নভেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা নং : ৭৩৯ ও ৭৪২।
৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : হাসান হাফিজুর রহমান, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, হাক্কানী পাবলিশার্স, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা নং : ৩৩৫,৩৪৯ ও ৩৫০
৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং-৩৫৫
৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং-৩৫৬
৭. দৈনিক বাংলার বাণী, ২ এপ্রিল ১৯৭২
৮. www.banglatribune.com/amp/৬২০৫১১/%.....
৯. যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট বিভাগ জনাব মৃণাল কান্তি বিশ্বাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
১০. বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : প্রয়োগ অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণা পরিচালক, হরিদাস ঠাকুর, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কোটবাড়ি, কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৫
১১. বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : প্রয়োগ অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণা পরিচালক, হরিদাস ঠাকুর, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কোটবাড়ি, কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা নং-৩০১
১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং-৩০৩-৩০৪
১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং-৩০৬-৩০৭
১৪. সুজন মুস্তাফা মনওয়ার, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মতবাদ, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯; পৃষ্ঠা নং-১৪৭।
১৫. রশিদ হারুন অর, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কী ও কেন, বাংলা একাডেমি, ২০২০; পৃষ্ঠা নং-৪২।
১৬.সুজন মুস্তাফা মনওয়ার, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মতবাদ, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯; পৃষ্ঠা নং-১৪৭
১৭. রশিদ হারুন অর, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কী ও কেন, বাংলা একাডেমি, ২০২০; পৃষ্ঠা নং-৩৫
১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং-৩৬ ও ৩৭।
১৯. সুজন মুস্তাফা মনওয়ার, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মতবাদ, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯; পৃষ্ঠা নং-৯০ ও ৯১

ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস : নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়

বিস্তারিত দৃষ্টি

আমিনুল ইসলাম

মানুষ উন্নয়ন চায়। সমাজ উন্নয়ন চায়। রাষ্ট্র উন্নয়ন চায়। রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন চায়। কিন্তু উন্নয়ন কি? সহজ কথায় উন্নয়ন হচ্ছে কোনো অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন। কেন উন্নয়ন? কারণ মানুষ যা আছে তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে অভ্যস্ত নয়। তার লক্ষ্য Good থেকে Better; Better থেকে Best; কিন্তু Best এর সংজ্ঞা আজও অনির্ণীত; Best অবস্থা আজও অপরিমাপিত। অথচ মানুষের লক্ষ্য হলো, বাসনা হলো সেই Best অবস্থায় পৌঁছানো। ফলে উন্নয়ন অভিমুখে মানুষের অভিযাত্রার কোনো শেষ নেই, সমাপ্তি নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ধার করে বলা যায় মানুষের উন্নয়ন প্রয়াস হচ্ছে : 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে!' এটি যেমন ব্যক্তিমানুষের বেলায় সত্য, সমষ্টির

ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি জাতি বা রাষ্ট্র পর্যায়ে প্রযোজ্য। কিন্তু মানুষ কেন সমষ্টিবদ্ধ হয়? কারণ তার পক্ষে একা একা যথাযোগ্য জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। তার একাকিত্বের রাতে সঙ্গ দরকার; নির্জন বিকেলের বন্ধু দরকার; হৃদয়-প্রাণের অন্তরঙ্গ বাসনার ক্ষণে প্রেম দরকার; গল্প সোনার শ্রোতা দরকার; গান শোনানোর কণ্ঠশিল্পী দরকার; সুখের হাসি দেখে হাততালি দেওয়ার মানুষ দরকার; দুঃখের কান্না দেখে সমবেদনা জানানোর মানুষ দরকার। সবচেয়ে বেশি দরকার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পথের সাথি, নৌকা ঘাটে পৌঁছানোর জন্য মাঝিমাল্লা দল; প্রতিকূল শক্তিকে পরাজিত করার জন্য সংঘবদ্ধ সম্মিলিত শক্তি। এই বাস্তবতা থেকে জন্ম পরিবার, সংগঠন, সমাজ ও রাষ্ট্রের। তাই তো মানুষ 'সামাজিক জীব'। অ্যারিস্টটল যথার্থই বলেছেন, "Man is by nature a social animal; an individual who is unsocial naturally and not accidentally is either beneath our notice or more than human. Society is something that precedes the individual. Anyone who either cannot lead the common life or is so self- sufficient as not to need to, and therefore does not partake of society, is either a beast or a god. " মানুষ একা বসবাস করতে পারে না। আসলে কোনো প্রাণি তা পারে না। পিপীলিকা বা কাকের জোটবদ্ধতা আমাদের বিস্মিত করে। গবাদি পশুরাও পালে বা জোটে বসবাস করে। মানুষ প্রকৃতিতে ছিল অসহায়। তাই তাকে আরও বেশি করে জোটবদ্ধ হতে হয়েছিল। পরিবার , গোত্রতন্ত্র, সমাজ, ক্লাব, দল, রাষ্ট্র , জাতিসংঘ ইত্যাদি মানুষের জোটবদ্ধতার নানা রূপ। আসলে মানুষ আদিকাল থেকেই মূলত যূথবদ্ধ প্রাণি। একতাই বল- এই নীতি অবলম্বন করে সে প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণিকে বশে এনেছে এবং প্রকৃতির ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে। সেই সমবেত প্রচেষ্টার সংগঠিত আধুনিক রূপ হচ্ছে সমবায়।'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এটাই হচ্ছে সমবায়ের মূলমন্ত্র। আবার পদ্ধতিগতভাবে সমবায় হচ্ছে অরাজনৈতিক গণতান্ত্রিক সংগঠন বা উন্নয়ন দর্শন। এখানে রাজতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, দলতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র, চামচাতন্ত্র এসব চলে না। কিছু মানুষ স্বউদ্যোগ একত্রিত হয়ে নিজেদের মেধা, পুঁজি, শ্রম একত্রিত করে নিজেদের লক্ষ্য, পথচলা ঠিক করে এবং নিজেদের ভেতর থেকে নেতৃত্ব নির্বাচিত করে। সমবায়ীরা নিজেরাই উদ্যোক্তা, নিজেরাই কনসালট্যান্ট, নিজেরাই শ্রমিক, নিজেরাই নেতা, নিজেরাই অনুসারী, নিজেরাই সেবাদানকারী, নিজেরাই উপকারভোগী। সমবায় এর আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা বিচার করে বলা হয়ে থাকে 'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators)। আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা (ICA) এর ভাষ্যানুযায়ী সমবায় হচ্ছে "an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly- owned enterprises." আইসিএ ১৯৯৫ সালে সমবায়ের ৬টি নীতি বা মূল্যবোধকে চিহ্নিত করতঃ সেসব অনুসরণের জন্য সুপারিশ করে। সেগুলো হচ্ছে- (১) Self- help (২) self- responsibility (৩) democracy (৪) equality(৫) equity (৬) solidarity। সমবায়-চিন্তক ও উন্নয়নবিশারদ রামোস গং বলেছেন, " Cooperative members also share a sense of cooperation and co- participation in the whole stage of the cooperatives' decision making process." ঐতিহ্যগতভাবেই সমবায়ীরা সততা, স্বচ্ছতা, সামাজিক দায়িত্ব, অন্যের প্রতি যত্নবান থাকা প্রভৃতি নৈতিকতায় বিশ্বাসী হওয়ার কথা।

আমরা যদি সহজ করে বলি, তবে সমবায় হচ্ছে মানুষের নিজেদের দ্বারা সংগঠিত, অর্থায়িত ও নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত সংগঠন যা স্বভাবে স্বাধীন, আচরণে গণতান্ত্রিক, দৃষ্টিতে দূরগামী, বৈশিষ্ট্যে সহমর্মী এবং ভাবনায় উচ্চাকাঙ্খী। বলা হয় মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা। বাস্তব সত্য হচ্ছে বৈষম্যকবলিত সমাজে গরিব, পিছিয়ে থাকা, শোষিত বঞ্চিত মানুষের পক্ষে একা একা নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু দশজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা সহজেই সম্ভব। সেজন্যই বলা হয় 'দশের লাঠি একের বোঝা'। আর সমবায় সমিতিতে সকলেই একে অন্যের সহায়ক সহকর্মী বলে সেখানে যে নীতি অবলম্বন করা হয় তা হচ্ছে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। যারা ধনী অথবা সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান , তাদের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই বহু কিছু অর্জন করা সম্ভব ; বহু প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব। তাদের সংঘবদ্ধ না হলেও চলে। তাছাড়া তাদের জন্য রয়েছে প্রশাসন তাদের জন্য রয়েছে রাষ্ট্র। অন্যদিকে সমাজের অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত ও সামাজিকভাবে নিপীড়িত মানুষেরা সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা ব্যক্তি হিসেবে দুর্বল কিন্তু সম্মিলিতভাবে শক্তিশালী। তারা এককভাবে প্রায় কিছুই করতে পারে না কিন্তু সম্মিলিতভাবে প্রায় সবকিছুই করতে পারে সফলতার সাথে। একতাই শক্তি একথাটি এ ধরনের সাধারণ মানুষের জন্যই বেশি প্রযোজ্য। এই একতার নীতিই হচ্ছে সমবায়ের মূলভিত্তি। এই নীতি নিয়ে সম্মিলিত হলে প্রতিজ্ঞায় ও প্রচেষ্টায় সফলতা অনিবার্য। সেজন্যই বিদ্রোহী কবি, নিপীড়িত বঞ্চিত শোষিত সাধারণ মানুষের মুক্তির সোচ্চার স্বপ্নদ্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমবায়কে স্বাগত জানিয়ে রচনা করেছিলেন 'সমবায়-সংগীত' যা নিম্নরূপ,

'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয় রে, আয়।
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র- 'সমবায়, সমবায়!'
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!
মিলিত হইনি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায়।
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,
মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়।
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে
এক হয় নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি আসি। রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়।

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত সমবায়-সংগীতে সমবায়ের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয়তা ও মহিমা চমৎকারভাবে এবং পরিপূর্ণ রূপে ফুটে ওঠেছে। মূলত সমবায় হচ্ছে একতাই বল, গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং জনগণই ক্ষমতার উৎস প্রভৃতি আপ্তবাক্যের অনুকূলে ও পথ ধরে মানুষের সমবেত শক্তির উদ্বোধন, উন্মোচন ও বিকাশ সাধনের প্রকৃষ্টতম পন্থা। অসাধারণ ক্ষমতাধর বা প্রতিভাধর মানুষ একা একা অনেক কিছু অর্জন করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ পারেন না। সাধারণ মানুষ পারেন যখন তারা একতাবদ্ধ হন। তাদের জন্যই এ কথাটি প্রযোজ্য : United we stand, divided we fall। সমবায় হচ্ছে বিভাজিত নেতৃত্বহীন সাধারণ মানুষকে একতাবদ্ধ করে সামগ্রিক উন্নতি অর্জনের পথ। আবার সমবায় হচ্ছে অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের সম্মিলিত পুঁজি, সম্মিলিত মেধা, সম্মিলিত শ্রম, সম্মিলিত ভালোবাসা এবং ভেতরের নির্বাচিত নেতৃত্ব কাজে আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বনির্বাচিত স্বনির্ভর উন্নয়ন পদ্ধতি। সমবায় কেবলই অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন, এটি হচ্ছে উন্নত নৈতিকতা বিশিষ্ট একটি সামাজিক জীবনপ্রণালি। এখানে পরস্পরের

প্রতি পরস্পরের স্ব-আরোপিত ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা ক্রিয়াশীল থাকে যা তাকে একটা বৃহত্তর পরিবারের গুণাবলিতে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে। সমবায়-বিশেষজ্ঞ ভারতের Sri Ramakrishna Vidyalaya এর College of Rural Higher Education এর প্রিন্সিপ্যাল ও.আর. কৃষ্ণস্বামী যথার্থই বলেছেন, ''Cooperative is a new form of economic organization with a social philosophy of high order and a moral content. It is an economic miracle and a potent force for transforming the existing competitive and inequitable society into an egalitarian Cooperative community.''

২. সমবায়ের আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট

সমবায়ের বর্তমান রূপের উৎস সন্ধান করতে গেলে একথা স্বীকার করতেই হয়ে যে শিল্পবিপ্লবের জয়ধ্বনি-উচ্চকিত ইংল্যান্ডে রচডেলের তাঁতিরা সমবায় সমিতিকে আধুনিক রূপ প্রদান করেছিলেন এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন। মূলত শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যই এই সমবেত উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। আসলে সমবায় হচ্ছে সমাজের দুর্বল ও অসংগঠিত মানুষকে সংগঠিত করে নিজেদের দ্বারা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের দর্শন ও পদ্ধতি। ইংল্যান্ডে ১৭৬৯ সালে কনজুমার কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে আধুনিক সমবায়ের প্রচলন ঘটে উনিশ শতকে ইউরোপে। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপে কলকারাখানার শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠতে থাকলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের শ্রমিকরা নিজেদের আর্থসমাজিক সুরক্ষায় বর্তমান ধাঁচের সমবায় সমিতি গঠনে এগিয়ে আসে। ১৮৩০ সাল নাগাদ ইংল্যান্ডে শতশত সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। রচডেলের তাঁতিরা ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন আধুনিক গঠনের সমবায় সমিতি। তারা সমবায় সমিতি পরিচালনার নীতিমালা তৈরি করেন যা আজও অনুসৃত হয়ে আসছে। সময় গেছে। দিনদিন সমবায় জনপ্রিয় হয়েছে এবং নতুন নতুন সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আজ পৃথিবীর সবক'টি মহাদেশে সমবায় বিস্তৃত। বর্তমানে পৃথিবীর ১৯৫টি দেশে সমবায় কাজ করছে। অধিকাংশ দেশে আইনের মাধ্যমে সমবায় বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনেক দেশে সমবায়কে আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে কিছুটা নিজেদের উপযোগী করে। তবে সমবায়ের মর্মবাণী অক্ষুণ্ন থেকেছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংজ্ঞাতেই। প্রতিটি দেশেই সমবায় কোনো না কোনো মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিতি হয়েছে। কেনিয়ায় শুধু সমবায়ের জন্য আলাদা একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৫২ সালে বিমা বিষয়ক সমবায় সমিতি এবং ১৮১০ সালে দুগ্ধ বিষয়ক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৯,০০০ এরও বেশি বিভিন্ন ক্যাটাগরির সমবায় সমিতি আছে; তারা ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করেছে এবং বাৎসরিক আর্থিক উপার্জন ৬৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা ধরনের সমবায় সমিতি রয়েছে এবং সমবায় অর্থনীতি বিষয়ক বহু তত্ত্ব, নীতি ও মতবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশেও সমবায় সমিতি আছে। বহু সমবায় সমিতির সাফল্য ও খ্যাতি বিশ্বজোড়া। স্পেনের তেমনি একটি সমতি হচ্ছে স্পেনের শিল্প-সমবায় সমিতি যার নাম Mondragn Cooperative Corporation। এটি হচ্ছে স্পেনের শ্রমিকদের সমবায় সংগঠন যা ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমগ্র স্পেন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর বিজনেস সম্প্রসারিত। বার্ষিক রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ২০১৫ সালে ছিল ১২.১১০ বিলিয়ন ডলার; সম্পদের পরিমাণ ২৪.৭২৫ বিলিয়ন ডলার; নিয়োজিত জনবল ৮১,৫০৭ জন। এই সমিতির অপারেশন এরিয়া হচ্ছে ফিন্যান্স, ইন্ডাস্ট্রি, অর্থলগ্নি ও জ্ঞান। আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা বা আইসিএ-এর গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক এই সমিতির কার্যাবলি পরিচালিত হয়ে আসছে। শ্রমিকরাই এই সমিতির প্রাণ এবং তারা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

আজ মুক্তবাজার নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়িত পৃথিবীতে একদিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি অধিকতর আগ্রাসী হয়ে ওঠেছে, অন্যদিকে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বহু দেশে ক্রমবর্ধমান হারে সমবায় পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে মানুষ। পৃথিবীতে এখন প্রায় ৩০ লক্ষ সমবায় সমিতি সমিতি আছে যাদের মোট সদস্য প্রায় ১০০ কোটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি ৩ জনের ১ জন সমবায়ী; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমবায় সমিতিগুলো প্রতিবছর ২০ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। সেখানকার কৃষকদেরা প্রায় সবাই কৃষি সমবায় সমিতির সদস্য। কানাডার জনসংখ্যা ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রায় ; তার মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোক সমবায়ী (মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৮%)। কানাডার ৮৩% মানুষ প্রাইভেট ব্যবসায় কেন্দ্রের চেয়ে সমবায় মার্কেটের পণ্য কেনা বেশি পছন্দ করে। জাপানে জনসংখ্যার প্রায় ১২ কোটি ৬৩ লক্ষ। তার মধ্যে ৪ কোটি মানুষ সমবায়ী যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩২%। সিঙ্গাপুরের মোট জনসংখ্যার ২৫% এবং মালেশিয়ার মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫% সমবায় সমিতির সদস্য। ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়ায় ৯০% কৃষক হচ্ছেন সমবায়ী। নিউজিল্যান্ডের অর্থনীতির মূলে এখন সমবায়। তাই একে বলা হয়.'The New Zealand Cooperative Economy'।নিউজিল্যান্ডের ৯০% দুগ্ধশিল্প; মাংস রপ্তানির ৯০%, গবাদি পশুপালনের ৫০%, সার বজারের ৯০% অধিক এবং খুচরো মার্কেটের ৬০% সেদেশের ৩০টি বৃহদায়তন সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত। আজকের উন্নত ডেনমার্ক মূলত সমবায়ের অবদানে গড়ে ওঠা। সেই ১৭৯০ সালে সৃষ্ট ড্যানিস কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট [Danish cooperative movement (Danish: Andelsbev gelsen)] সময়ের পরিক্রমায় এতটাই সাফল্য লাভ করে যে ডেনমার্কের কৃষি এবং শিল্প দুই-ই মূলত সমবায়ের পথ অনুসরণ করে এবং ডেনমার্ককে উন্নত দেশে উন্নীত করে। আসলে ১৩০০ সাল থেকেই ডেনমার্কের কৃষিজমি (Farm soil) সমবায় পদ্ধতির আওতাভুক্ত ছিল। সেদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবক্ষেত্রেই সমবায় সম্প্রসারিত হয়েছে। কোনো না কোনো সমবায় সমিতির সদস্য হওয়া গৌরবের ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। সমবায় সেদেশের অর্থনীতিকে 'সকলের অর্থনীতি (We- Economoy)-তে রূপান্তর করেছিল, যা ডেনমার্ককে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে উন্নীত হতে সহায়তা করেছিল।

অস্ট্রেলিয়ায় ৯০% ডেইরি পণ্য সমবায়ভিত্তিতে উৎপাদিত; জাপানে ভোক্তা সমবায় সমিতি (কনজুমার কো-অপারেটিভ) সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ যার ৯০% মহিলা; ইউরোপে সমবায়ীর সংখ্যা ১৪ কোটি মানুষ; সেখানে ৩ লাখ সমবায় সমিতি ২৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করেছে। বিশ্বে ১০ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান করেছে সমবায়। আজ আফ্রিকা মহাদেশের ৪০% এর বেশি পরিবার সমবায়ের সাথে যুক্ত। সমবায় সেখানে সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থা যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং প্রচুর মানুষের জন্য চাকরি ও স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। ব্রাজিল হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমবায়ী দেশ। সেখানকার কৃষি, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সেক্টরে সমবায় প্রতিষ্ঠিত। ব্রাজিলের স্বাস্থ্যসেবা ঘরে ঘরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির ভূমিকা অগ্রগণ্য। ব্রাজিলের জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট M rcio Lopes de Freitas, বলেছেন, "The Brazilian population is open to cooperation due to its diversity—we believe that cooperatives will be fundamental for the development of our economy,"। আইসিএর মূল্যায়ন অনুযায়ী ব্রাজিল ,নরওয়ে, স্পেন, ফিনল্যান্ড,"… have exceptionally strong cooperative business sectors." ভারতে 'সাদাবিপ্লব'(White Revolution) সৃষ্টিকারী গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ হচ্ছে সেদেশের বৃহত্তম খাদ্যপণ্য বাজারজাতকরণ অর্গানাইজেশন যার পণ্যের

ব্র্যান্ড নাম 'আমুল' এবং যা ভারতকে পৃথিবীর বৃহত্তম দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী দেশে উন্নীত করেছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সমবায়ের ভূমিকা ও সাফল্য বহুমুখী। এটি একদিকে পিছিয়ে পড়া ও পিছিয়ে থাকা মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় সহায়তা করে থাকে; অন্যদিকে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতায়ন, গণতান্ত্রিক চর্চা ও নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করে যার ইতিবাচক ফল ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। সমবায় সমিতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে উন্নীত করে যার ফলে তাদেরকে শোষণ করা, তাদের ওপর বঞ্চনা চাপিয়ে দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা সব মহাদেশেই সমবায় সমিতির এমন ইতিবাচক ভূমিকা সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত ব্যবস্থাপনায় প্রমাণিত। কোথাও কোথাও এটি চরম পুঁজিবাদের বিকল্প অর্থনৈতিক সিস্টেম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। মার্কিন অধ্যাপক ড. উল্ফ বলেছেন মন্ড্রাগাঁও সমবায় সমিতি হচ্ছে 'a working model of an alternative to the capitalist mode of production.'

ব্রিটিশরা এদেশে ১৯০৪ সালে সমবায় প্রথার চালু করে মূলত জমিদার-মহাজনদের শোষণ থেকে সাধারণ কৃষকদের বাঁচানোর লক্ষ্যে। ব্রিটিশদের পথনির্দেশনায় ১৯০৬ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ, ১৯০৯ সালে খুলনায় রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯১৩ সালে গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এবং ১৯১৪ সালে বগুঁড়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ লিঃ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের ব্যাংক এখনও রয়েছে প্রায় শ'খানেক। এই ব্যাংকগুলো আওতাধীন কৃষক সমবায় সমিতিগুলোকে স্বল্পসুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দিত। কালক্রমে সমবায় সমিতির প্রকারভেদ বৃদ্ধি পায়। জেলে, তাঁতি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বিত্তহীন মানুষ এবং নারীরা সমবায় সমিতি গঠনে এগিয়ে আসেন। বর্তমানে দেশে মোট ৩৫ প্রকারের সমবায় সমিতি আছে যার মোট সংখ্যা ১ লক্ষ ৯৬ হাজার। ২০২০-২০২১ বছর নাগাদ দেশে মোট সমবায়ীর সংখ্যা ১ কোটি ১৭ লক্ষ জন। সমবায়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয়েছে ৯,২৫,৬৯৯ জন মানুষের। জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ সমবায়ের সাথে জড়িত। দেশের অর্থনীতিতে সমবায় সেক্টরের ভূমিকা আলাদাভাবে পরিমাপ করা হয় না। তবে টিআইবি-এর গবেষণালব্ধ তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের জিডিপি-তে সমবায় সেক্টরের অবদান ১.৮৮%। কিন্তু বাস্তবে সমবায় সেক্টরের অবদান কয়েকগুণ বেশি। কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, বস্ত্রখাত, দুগ্ধ উৎপাদন, চামড়াজাত শিল্প, মৃৎশিল্প, মানব সম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি সেক্টরে অর্থনৈতিক অবদানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায়ের সহযোগী ভূমিকা রয়েছে। বাংলোদেশে কৃষির যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন, তার পেছনেও দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতির ভূমিকা অগ্রগণ্য। কিন্তু এসব অবদান যথাযথভাবে পরিমাপ করা যায়নি বলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমবায়ের অবস্থান আজও পূর্ণ মাত্রায় উপস্থাপিত হয়নি।

৩. কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে সমবায়

ক. কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সমবায়

সমবায়ের সাথে কৃষকের উন্নয়ন ও কৃষির উন্নয়নের সম্পর্ক পুরোনো এবং তা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। ডেনমার্কের কৃষি সেই ১৩০০ সাল থেকেই সমবায়ভিত্তিক। পরবর্তীতে তা আধুনিক সমবায় ব্যবস্থার আওতাভুক্ত হয়। সেদেশের খামার ও দুগ্ধশিল্পের ৯৭% সমবায় নির্ভর। কসাইখানা, শস্যের আড়ত থেকে শুরু করে ফ্রিজিং হাউজ সবই সমবায়ের আওতায় পরিচালিত। কয়েকটি বড় আকারে সমবায়ী শিল্প আজও সেদেশের কৃষির নির্ভরযোগ্য পিলার যার মধ্যে রয়েছে Arla foods, Danish Crown meat and DLG foodstuff, fertilizer and grain প্রভৃতি। ডেনমার্কের জিডিপি-তে কৃষি সেক্টরের অবদান এখন খুবই কম ১%-২%। তবে কৃষির উন্নয়নমূলক বিবর্তনে এবং বর্তমান। অগ্রগতিতে সমবায় ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ামকের অবস্থানে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকরা সমবায় সমিতির সদস্য। ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়ায় ৯০% কৃষক হচ্ছেন সমবায়ী : নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় ৯০% ডেইরি পণ্য সমবায়ভিত্তিতে উৎপাদিত। নিউজিল্যান্ডের অর্থনীতির মূলে এখন সমবায়। নিউজিল্যান্ডের কৃষিখাত মানেই সমবায় খাত। নিউজিল্যান্ডের ৯০% দুগ্ধশিল্প; মাংস রপ্তানির ৯০%, গবাদি পশুপালনের ৫০%, সার বাজারের ৯০% অধিক এবং খুচরো মার্কেটের ৬০% সেদেশের ৩০টি বৃহদায়তন সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত। আফ্রিকা মহাদেশে ৪০% লোক সমবায়ের সাথে যুক্ত। সেখানে কৃষকদের তাদের উৎপাদিত পণ্য দেশে এবং বিদেশে বাজারজাতকরণে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে সমবায়। আফ্রিকায় বছরের পর বছর মার্কেটিং সমবায় সমিতিগুলো কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং সেগুলোই সবচেয়ে জনপ্রিয় সমবায় সমিতি। ভিয়েতনামের কৃষি এখন মূলতই সমবায়ভিত্তিক। ভিয়েতনামে মোট সমবায় সমিতি হচ্ছে ২৪৬১৮টি; তারমধ্যে ৬৫% হচ্ছে কৃষি সমবায় সমিতি। মোট কৃষি সমবিায় সমিতি প্রায় ২০০০০ ; সদস্য সংখ্যা ১কোটি ৩৫ লক্ষের কিছু বেশি। নিয়োজিত জনবল ৪৫,৬৩,০০০। ভারতে সিংহভাগ মানুষ বাস করে গ্রামে এবং তাদের মূল পেশা কৃষি। ভারতের কৃষিতে সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্র ঋণ, দুগ্ধশিল্প, বনায়ন, ফার্টিলাইজার, পোল্ট্রি ফার্ম প্রভৃতি সেক্টরে সমবায় খুবই সফল ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্রাজিলে মোট ১৩ প্রকারের সমবায় সমিতি আছে। সেখানে কৃষি সমবায় দিনদিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সেদেশের সমবায় সমিতির ২৩% হচ্ছে কৃষি সমবায় সমিতি। মোট সমবায় সমিতি ৬,৮৮৭টি; তার মধ্যে কৃষি সমবায় সমিতি ১,৬১৮টি। ব্রাজিলের ৫টি বৃহৎ কৃষি সমবায় সমিতি কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। সেদেশের বৃহত্তম কৃষি সমবায় সমিতির অরোরা আলিমেন্টস (Arora Alimentos) বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে। এই সমিতি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; এর আওতায় ১২টি এফিলিয়েটেড সমবায় সমিতি আছে; সংযুক্ত পরিবারের সংখ্যা ৭৫ হাজারের অধিক; নিয়োজিত কর্মচারীর সংখ্যা ২৮ হাজারের বেশি; তার সাথে আছে ৮ হাজারের বেশি এফিলিয়েটেড সমিতির কর্মচারী। সমিতিটি ২০১৬ সালে ২.৫ বিলিয়ন ডলারের রাজস্ব আয় করেছিল। সমিতিটি প্রযুক্তি ও মাংস উৎপাদনের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। ব্রাজিলের আরেকটি বিখ্যাত কৃষি সমবায় সমিতি হচ্ছে কপারসুকার (Copersucar)। ৫০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সমিতিটির ৩৪টি প্রোডাকশন ইউনিট আছে। চিনি ও মদ উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য এটি বিশ্ববিখ্যাত। ২০১৬/২০১৭ বছরে সমিতিটি ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মুনাফা করেছিল এবং মোট রাজস্ব ছিল ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্রাজিলের কোমো এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ(COAMO Agro- Industrial Cooperativa) সেদেশের মোট খাদ্যশস্য ও ফাইবারের ৩.৫%, এবং পারানা রাজ্যের মোট ফসলের ১৭% উৎপাদন করে। ব্রাজিলের ৭৯টি কৃষি সমবায় সমিতি ইউনিয়ন মিলে ১৯৭০ সালে এই কৃষি-শিল্প সমবায় সমিতিটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। চীনে কৃষিঋণের ৮৫% সরবরাহ করে থাকে সেদেশের গ্রামীণ ঋণদান সমবায় সমিতিগুলো। চীনের কৃষিতে বিপ্লব সাধন ও কৃষির উন্নয়নে সমবায় সমিতির ভূমিকা খুবই উজ্জ্বল। যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামের কৃষিপ্রধান অর্থনীতিকে বেগবান করে তোলার লক্ষ্যে মূলত সমবায় পদ্ধতিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেদেশের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভিয়েতনাম ফার্মার্স ইউনিয়ন এবং ভিয়েতনাম কো-অপারেটিভ অ্যালায়েন্স এর মধ্যে সম্প্রতি একটি কর্মসূচিভিত্তিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, , '...to implement the National Assembly's target of having

15,000 agricultural cooperatives and cooperative alliances operating effectively by 2020. Vietnam sets to have 15,000 effective agricultural cooperatives and cooperative alliances by 2020. ভিয়েতনামের হ্যানয়ে ২০১৯ সালের ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে সেদেশের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়কমন্ত্রী Ngyuen Xuan Cuong বলেছেন যে, কৃষির উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম এবং তিনি সেভাবে এগিয়ে আসার জন্য সেদেশের রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের সঙ্গেও সমবায়ের সংশ্লিষ্টতা বহুদিনের। আদিকাল থেকেই বাংলাদেশে একটি কৃষিপ্রধান ভূখণ্ড। শত শত বছর যাবৎ বাংলার মানুষের অর্থনীতি ছিল মূলতই কৃষি। গ্রামের এসব কৃষক মানুষরা ছিল সাধারণ মানুষ; সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। মানবসমাজ চলমান রয়েছে আমরা যাদের বলি 'সাধারণ জনগণ', মূলত তাদের কর্মপ্রবাহের শক্তিমন্ত্রে। যারা খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন করেন, তারাই সচল রেখেছেন জীবনের গতি; তাদের কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সমাজ-সংসার-সভ্যতা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঐকতান' নামক কবিতায় বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন :

'চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার'।
....
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি'।

ব্রিটিশ আমলে জমিদারি প্রথা চালু করায় সাধারণ কৃষক-জেলে-তাঁতিদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে যা সেই সময়ে রচিত উপন্যাস-নাটক-কবিতা-গানে বাণীবদ্ধ হয়ে আছে আজও। মেহনতি মানুষের কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সুবিখ্যাত ' ওঠ রে চাষি জগদ্বাসী, ধর কষে লাঙল' গানে সেই অবস্থার ছবি তুলে ধরেছিলেন জীবন্তভাবে যার কয়েকটি লাইন এমন,

'ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায়-বা সেই গান গেল ভাই, কোথায় সে-কৃষাণ?
ও ভাই মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভরতেছে বোতল।
আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাই কো আমার হাত।'

কিন্তু ব্রিটিশরা নিজেদের সভ্য জাতি বলে দাবি করে এবং এদেশের সাধারণ মানুষ সবাই ক্ষুধায়-রোগে-শোকে-বঞ্চনায় ব্যাপকভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে তাদের শাসন টিকিয়ে রাখাও কঠিনতর হয়ে যাবে ভেবে তারা কৃষক-জেলে-তাঁতি প্রভৃতি সাধারণ মানুষদের বাঁচাতে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার একটি হচ্ছে সমবায় ব্যাংকিং। ব্রিটিশরা ১৯০৪ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায় পদ্ধতি চালু করে। বর্তমান বাংলাদেশে ১৯০৬ সালে সমবায় ব্যাংকিং চালু করা হয়। সেগুলোর নাম ছিল এলাকাভিত্তিক সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক। ১৯০৬ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯০৯ সালে খুলনায় রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯১৩ সালে গোপালগঞ্জ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং ১৯১৪ সালে বগুড়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে প্রায় শ'খানেক কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ব্যাংক আওতাধীন কৃষক সমবায় সমিতিগুলোকে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দিত। এতে করে কৃষকগণ জমিদার-মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি অতিসুদের শোষণ থেকে নিজেদের কিছুটা হলেও রক্ষা করার বিকল্প পথ পায়। সময়ের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হলো সমবায় ব্যাংকিং একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল কিন্তু নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে পরবর্তীতে সেই সোনালি সাফল্য অনেকখানি ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও ঋণ সরবরাহ অব্যাহত আছে। সমবায় ব্যাংকের পাশাপাশি কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকগুলো কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করে আসছে। এক্ষেত্রে সমবায় ব্যাংকগুলোর পাইওনিয়ারিং ভূমিকা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয় ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে। আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে বর্তমান বাংলাদেশ অংশে চালু হয় দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় যা পরবর্তীতে কুমিল্লা মডেল নামে খ্যাতি লাভ করে। কুমিল্লা মডেল পদ্ধতি দেশে কৃষিতে আধুনিকায়ন ঘটায় সেচযন্ত্র ও আধুনিক কীটনাশকের ব্যবহারের মাধ্যমে। আশির দশকে বাংলাদেশের কৃষিতে সবুজ বিপ্লব সংঘটিত হয় যা দেশকে কৃষি উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা এনে দেয়। দ্বিস্তর সমবায় ব্যবস্থা থেকে সৃষ্টি বিআরডিবি যা পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশের কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে কৃষি বিভাগের যে সাফল্য,. তার গোড়ায় রয়েছে সমবায়ের অবদান। কৃষি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে : কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতি (৫২,৩২৬টি), কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক (৭৫টি), কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি (৬৫টি), ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি (১০,০৬৩টি), উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় অ্যাসোসিয়েশন (৪৮৮টি) ও প্রাথমিক জমি বন্ধকি ব্যাংক (৬৮টি)। বর্তমানে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৭২,৪৬০টি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কর্তৃক এসব কৃষি সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। কিন্তু বর্তমানে দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় পথ হারিয়ে ফেলেছে- জড়িয়ে গিয়ে নানাবিধ সমস্যায়, জটিলতায়, নিষ্ঠাবান নেতৃত্বের অভাবে ও অব্যবস্থপনায়।

খ. দুগ্ধশিল্পের উন্নয়নে সমবায়

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে বলা যায়, দুগ্ধশিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের সাথে সমবায়ের নামটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। ডেনমার্ক দুধ উৎপাদন ও বিদেশে রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। ডেনমার্কের দুগ্ধশিল্পকে বর্তমান অবস্থানে উন্নীতকরণে সমবায় সমিতির ভূমিকা মুখ্য। ডেনমার্কে প্রথম সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮২ সালে এবং ১৯০০ সালের মধ্যে সেদেশের সকল ডেইরি সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ডেনমার্কের কৃষিজাত রপ্তানি পণ্যে ২০% হচ্ছে দুধ দুগ্ধজাত পণ্য। সেখানে দুগ্ধ উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি সবকিছুই সমবায়ভিত্তিক। ডেনমার্কে উৎপাদিত ৯৭% দুধ সমবায় সমিতিতে যায়। সেদেশে উৎপাদিত দুধ অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটায়ে মোট উৎপাদিত দুধের দুই তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

নিউজিল্যান্ডের অর্থনীতি তার দুগ্ধশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বের দুগ্ধ উৎপাদনের ২% নিউজিল্যান্ড উৎপাদন করে কিন্তু সেই উৎপাদনের ৯৫% বিদেশে রপ্তানি করে। এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে সমবায় সমিতি। নিউজিল্যান্ডের দুগ্ধশিল্প গত এক শতাব্দী যাবৎ সমবায়ের আওতাধীন রয়েছে। ২০২০ সাল অবধি Fonterra এবং Tatua নামক দুটি সমবায় সমিতি সেদেশের দুধ সংগ্রহ, প্রসেসিং এবং বাজারজাত ব্যবস্থাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। ফন্টেরা সমবায় সমিতি দেশের ৯৬% কাঁচা দুধ সংগ্রহ করতঃ প্রসেস করে।

ব্রিটিশ ভারতে ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আজকের ভারতে সাদা বিপ্লব সৃষ্টিকারী গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ হচ্ছে সেদেশের বৃহত্তম খাদ্যপণ্য বাজারজাতকরণ অর্গানাইজেশন যার পণ্যের ব্র্যান্ড নাম 'আমুল' এবং যা ভারতকে পৃথিবীর বৃহত্তম দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী দেশে উন্নীত করেছে। গুজরাটের ১৮,৭০০টি গ্রামের প্রায় ৩৬ লক্ষ দুধ উৎপাদনকারী

সমবায় » ২৭

কৃষক বা গোয়ালার এই সমবায় ইউনিয়ন প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ লিটার উৎপাদন করে। এ সমিতির ২০২১ সালে ৩৮,৫৫০ কোটি ভারতীয় রুপি মূল্যমানের দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার বাজারজাত করেছে এবং বাৎসরিক টার্নওভার ছিল ৫০,০০০ কোটি ভারতীয় রুপি যা গত বছরের তুলনায় ১৭% বেশি। অন্যদিকে সমিতির উপার্জিত রাজস্বের ৮০% পায় দুধ উৎপাদনকারী কৃষকগণ।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'আমার সন্তান' কবিতায় অন্নপূর্ণা দেবীকে পার করার বিনিময়ে দেবীর কাছে একজন মা--ঈশ্বরী পাটুনীর প্রার্থনা ছিল, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' দেবী তা মঞ্জুর করেছিলেন : তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান/দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।' কিন্তু সেই বর বাংলার সব ঘরে পৌঁছায়নি। আমরা নজরুলের 'দারিদ্র্য' শীর্ষক কবিতাতেই সেই বঞ্চনার চিত্র দেখেছি :

'পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!- মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি!'

গুজরাটের আমুলের কয়েকমাস আগেই সিরাজগঞ্জে ব্যক্তিমালিকানায় দুগ্ধশিল্প স্থাপনের কাজ শুরু হয় যার বর্তমান রূপ মিল্কভিটা। আমুল আজ বিশ্বখ্যাত সমবায় সফল সমিতি; মিল্কভিটার অবস্থা শোচনীয়।

উল্লেখ্য, আজকের মিল্কভিটাকে জাতীয় রূপ দেওয়ার এবং তার মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধশিল্পে স্বনির্ভর করার সমবায়ী স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এটির নাম হয় 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড'। দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখছে। এসব সমিতির মধ্যে আছে প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ। এই সমিতির উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ড নাম মিল্কভিটা। বর্তমানে প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যা ৩,০৮৪টি, ব্যক্তি সদস্য ১,৩২,৬০৮ জন, সমবায়ীদের অংশগত মূলধন ৪২.২৯ কোটি, সরকারি ইক্যুইটি ৪১.৫০ কোটি, সরকারি ঋণ ২৬.২০ কোটি এবং আবর্তক ঋণ ৫ কোটি টাকা। মিল্কভিটা গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। এই সমিতি ২০১৯-'২০ অর্থবছরে প্রায় ৪.৩০ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে। ফলে সমবায়ী দুগ্ধ উল্লেখ্য, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে মিল্কভিটার নিট লাভ ছিল ১৫.১১৮৮ কোটি টাকা, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১৫.৮১৯৬ কোটি টাকা, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ১৭.১২০৭ কোটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ বছরে তা ৪.২২ কোটি টাকায়, ২০১৭-২০১৮ সালে ৩.৫৩৪৫ কোটি টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ বছরে ২.৭৮৯৭ কোটি টাকায় নেমে আসে। ২০১৯-২০২০ বছরে তা ১.১১৬৪ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৭ কোটি প্রায়। দুধের প্রয়োজনীয়তা ও বাজার দুই-ই অনেক বড়। লাখ লাখ মানুষ গরু পালন ও দুগ্ধ উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিতে হলে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ-কে আরও বেশি বেগবান, আরও বেশি বিস্তৃত, আরও বেশি লাভজনক করে তোলা ছাড়া পথ নেই। বাংলাদেশের মিল্কভিটার একজন ত্রিভুবনদাস প্যাটেল দরকার ছিল প্রথম থেকেই। এখনও সেই প্রয়োজন বহুগুণে বেড়েছে।

গ. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমবায়

শিল্পবিপ্লবের ফলে নতুন নতুন কলকারাখান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ; প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বাড়তি শ্রমিকের যাদের নাম শিল্পশ্রমিক। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থেকেছে এবং যত দিন গেছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রযুক্তির অকল্পনীয় উন্নয়ন ও প্রসারের ফলে বেকারত্ব সমস্যা প্রকট হয়েছে। সমবায় সমিতি বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে এবং বেকারদের সংগঠিত করে উদ্যোক্তায় পরিণত করে। বিশ্বে ২৮ কোটি (২৮০ মিলিয়ন) মানুষের কর্মসংস্থান করেছে সমবায়। ইউরোপে সমবায়ীর সংখ্যা ১৪ কোটি মানুষ; সেখানে ৩ লাখ সমবায় সমিতি ২৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করেছে। স্পেনের The Mondragon Corporation নামক সমবায় সমিতি ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৮১,৫০৭ জন মানুষের কর্মসংস্থান করেছে; ভারতের গুজরাট সমবায় দুধ বিপণন ফেডারেশন লিঃ (জিসিএমএমএফ) নামক সমবায় সমিতির সদস্য প্রায় ৩৬ লাখ গোয়ালা এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১ হাজারের বেশি। বলতে গেলে গ্রামের ৩৬ লাখ গোয়ালার জীবিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে রেখেছে একটি সমবায় সমিতি। আজ সারা পৃথিবীতে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ; সমবায়ীর সংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি যা বিশ্ব জনসংখ্যার ১২% এর বেশি। এবং পৃথিবীর মোট কর্মসংস্থানের ১০% সমবায় সমিতিগুলো করেছে। আইসিএ বলছে, সমবায় টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে , ২৮ কোটি মানুষের চাকরি অথবা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, যা পৃথিবীর মোট কর্মজীবীর মানুষের ১০% প্রায়। আফ্রিকায় বেকার সমস্যা সমাধান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমবায়ের অবদান ও সম্ভাবনা সম্পর্কে এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আফ্রিকায় সময় সমিতিগুলো প্রণিধানযোগ্য সংখ্যক মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। তবে এখনও সেখানে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমবায়ের আরও ভূমিকা পালনের ব্যাপক সুযোগ আছে। সাধারণত সমিতিগুলো শ্রমঘন অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। সেগুলো আর্থিকভাবেও লাভজনক। আইএলও বিষয়টি প্রশংসার চোখে দেখে।

"The present report shows that African cooperatives have created a sizeable number of salaried jobs; yet, their biggest employment creation potential lies in the field of direct and indirect self- employment. Cooperatives do have a comparative job creation advantage over other types of enterprises: they are labour intensive by nature, they are cost- effective because of member commitment and participation, they generate economies of scale and scope through horizontal and vertical integration, they establish links between the informal and the formal sectors, and they put economic and social development on a broader base. Worker- owned cooperatives provide their members with decent, permanent Employment and Cooperatives in Africa ILO Cooperative Branch 2 jobs; client- owned cooperatives, which are predominant in the agricultural sector, can stabilize existing self- employment in rural areas; financial cooperatives can mobilize savings among the poorest and thus accumulate capital for productive investment; and social cooperatives provide self- employed workers with a minimum of social security while creating jobs in the social service sector."

বাংলাদেশে সমবায় সমিতিগুলো ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯,২৫,৬৯৯ জন মানুষের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর্মসংস্থান করেছে। দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ সমবায়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে। সমবায়ের মূল কাজ হচ্ছে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। সমবায় বাংলাদেশের ৩০/৩৫ প্রকারের কাজে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবে এই সাফল্য প্রয়োজনের অনুপাতে খুব কম। খুবই সীমিত।

ঘ. ক্ষুদ্র সঞ্চয় ঋণ সরবরাহে সমবায়

আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থার তথ্যমতে ২০১৭ সালে পৃথিবীর ৬টি মহাদেশের ১২০টি দেশে ৮৫,৪০০টি ক্রেডিট ইউনিয়ন ক্রিয়াশীল ছিল যাদের মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ২,১৯১ বিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর ৯.৩৮% মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে যাদের সংখ্যা ২৭.৪২ কোটি। আফ্রিকা মহাদেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি এই কর্মসূচি দ্বারা উপকৃত হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশে মোট ক্রেডিট ইউনিয়নের সংখ্যা ৩৯,৪৪৭ টি যা বিশ্ব ক্রেডিট ইউনিয়নের ৪৬.২% কিন্তু বৈশ্বিক মানচিত্রে সংশ্লিষ্ট সমবায়ীর সংখ্যা মাত্র ১৩% এবং সম্পদের পরিমাণ ০.৫% ভাগ। আফ্রিকার ১৩.৮% মানুষ এই কর্মসূচির আওতায় ছিল। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকায় ক্রেডিট ইউনিয়নের সংখ্যা মাত্র ৭% কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সদস্য ৪৬.৭%, সম্পদের পরিমাণ ৮১.৫% এবং ৪৮.৮৮% মানুষের কাছে পৌঁছেছে এই কর্মসূচি। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে ৯.১৬% মানুষ ক্ষুদ্র ঋণের আওতাভুক্ত। আয়ারল্যান্ড ও গ্রেট ব্রিটেন ব্যতীত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বলে সেসব দেশে ক্রেডিট ইউনিয়নের সংখ্যা ও কর্মসূচি কম। পূর্ব ইউরোপে ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। আফ্রিকায় সঞ্চয় ও ঋণ সমবায় সমিতিগুলোর ভূমিকা খুবই উজ্জ্বল। ১৯৬০ সাল থেকে এসব সমিতি কাজ করে আসছে। যেসব এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক সুবধা নেই, মূলত সেসকল এলাকায় এ ধরনের সমিতি কাজ করে থাকে। পৃথিবীর ২৫% মানুষ বাস করে চীনে। সেখানকার গ্রামীণ মানুষের ৭৫% আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সেবার আওতায় বাইরে রয়ে গেছে। এসব মানুষকে আর্থিক সেবা দিয়ে থাকে রুরাল ক্রেডিট কো-অপারেটিভগুলো। ১৯৫০ সালের দিকে রুরাল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ যাত্রা শুরু করে। ২০০৩ সালের হিসাব মতে চীনে ৩২,৩৯৭টি রুরাল সমবায় সমিতি (আরসিসি) ছিল; কর্মরত কর্মচারী ছিল ৬,২৮,০০০ জন। মোট রুরাল ক্রেডিট ইউনিয়ন ২,৪৪১টি। সমিতিগুলো ব্যাংকিং সেক্টরের ১১.৫% ডিপোজিট, ১০% ঋণ এবং কৃষিঋণের ৮৫% কাভার করে। অর্থাৎ চীনে কৃষিঋণ মূলত সমবায়ভিত্তিক। গবেষণায় দেখা গেছে কৃষি উৎপাদনে এসকল আরসিসি প্রদত্ত ঋণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমিতির দেওয়া ঋণের ১% বৃদ্ধি করা হলে কৃষি উৎপাদন বাড়ে ০.০৮%।

গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক এবং আরও কিছু এনজিও দাবি করে আসছে যে তারাই দেশে ক্ষুদ্র ঋণ চালু করেছে। অথচ এ কাজটি ব্রিটিশ আমলেই শুরু করেছিল সমবায় ব্যাংকগুলো। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক ব্যাংকিং ও ঋণদান ব্যবস্থার প্রচলনের সাথে জড়িয়ে আছে সমবায়। আর সেই ব্যাংকগুলোই শিখিয়েছে কীভাবে সঞ্চয়কে বাড়তি লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করতে হয়, কীভাবে শোধ করতে হয় ঋণের কিস্তি। আমাদের কাছ থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে নেপালের সমবায়ীরা সেদেশে চালু করেছে সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি। তাদের সাফল্য এখন ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি ইত্যাদি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ১২,৩৮১টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১৪,৪২,৫১৩ জন। এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্ব) নামে একটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। কাল্ব-এর সদস্য সংখ্যা ৮১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধন ৩২১.৯০ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,১৮৬.৩৪ কোটি টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ২৯.৭৭ কোটি টাকা। একসময় সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণদান সমবায় সমিতিগুলোর কার্যক্রম ছিল বিস্তারিত, সাফল্য ছিল উল্লেখযোগ্য। এখন অবস্থা ক্রমাবনতিশীল। নেতৃত্বের অসাধুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, অর্থ আত্মসাৎ, অদূরদর্শিতা ও পুঁজির অভাব কালব-কে অবনতির দিকে টেনে ধরেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ আবশ্যক এবং উত্তরণ হতেই হবে। কারণ সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। বাংলাদেশে আধুনিক সমবায়ের আধুনিক জন্ম হয়েছিল ক্ষুদ্র ঋণ দান ও সঞ্চয়ের কথা মনে রেখে। মূলত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলোর দায়িত্ব ছিল কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার প্রভৃতি শ্রেণির সমবায়ীদের ঋণ সরবরাহ করা। একসময় তা সফলভাবে চলেছিল। এখন এসকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা নিস্প্রভ প্রায়। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক আছে এসব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাথার ওপর। এটিও এখন পতনশীল। ক্ষুদ্র কৃষক ও গরিব শ্রমিকদের ঋণ দেয় না ব্যাংকগুলো। তাদের আর্থিক আশ্রয় ও দুর্দিনের বন্ধু হতে পারে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ সমবায় সমিতিগুলো। সেজন্য দরকার মানবদরদি সমবায়ী উদ্যোগ ও আলোকিত নেতৃত্ব।

ঙ. পণ্য বাজারজাতকরণে সমবায়

নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং অন্যের পণ্য কিনে নিয়ে বাজারজাত করে মুনাফা অর্জন এই দুই ধরনের কাজই সমবায় সমিতিগুলো করে থাকে। যেসব দেশের কৃষকগণ সমবায় সমিতির মাধ্যমে নিজেদের সংঘবদ্ধ মার্কেট-পাওয়ারে পরিণত করতে পারে, তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ বাজারজাত করতে পারে এবং সঠিক মূল্য পায়। বৈশ্বিক স্তরে আন্তর্জাতিক বাজারে তারা বাজারজাতকরণের সামর্থ্য অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ তাইওয়ান, কোরিয়া, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কৃষকরা সমবায়ের মাধ্যমে ধান, গম প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থকারী ফসল বাজারজাতকরণের মাধ্যমে অধিক মূল্য প্রাপ্তিতে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে। তারা ৬-৭% প্রিমিয়াম পায়।

অর্থনীতির দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ। অর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কলে-কারখানায় কৃষিতে সেবায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তেমনি প্রয়োজন সেসব পণ্য ও সেবার যথাযথ বাজারজাতকরণ। সমবায় কাজ করে মূলত নিম্নবিত্ত শেণির মানুষকে নিয়ে। মধ্যবিত্তরাও সমবায়ের মাধ্যমে নিজেদের কল্যাণ সাধনে কাজ করে থাকে। এসব শ্রেণির মানুষকে ধনী বিলিওনার শিল্পপতি ও উৎপাদক শ্রেণির সঙ্গে প্রতিযোগিতা টিকে থাকতে হয়। এটা অসম প্রতিযোগিতা। নিম্নবিত্তের মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের পণ্যের বাজারজাত করা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। সেই পুঁজি, মেকানিজম তাদের আয়ত্তে থাকে না। সেটা সম্ভব হয় না। ফলে দালাল ফড়িয়া মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণির মানুষের কাছে চলে যায় লাভের সিংহভাগ। সেজন্য বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতিগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে পণ্যের বাজারজাতকরণে সমবায় কাজ করে যাচ্ছে সাফল্যের সাথে। ২০১৩ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা রিপোর্ট এ বিষয়ে তথ্য উপাত্তসহ বলেছে,

"Cooperatives play an important role and hold a significant market share in agricultural product distribution from farms to final consumers (Deller et al., 2009). For example, according to a publication by the International Labour Office, more than 50% of global agricultural output is marketed through cooperatives in Finland, Italy, and the Netherlands (Tchami, 2007). In 2002, agricultural cooperatives accounted for 27% of U.S. total farm marketing expenditure (USDA, ২008). Marketing cooperatives comprise about 53% of all cooperatives and product distribution represents 64% of the net business volume of cooperatives in the U.S. (USDA, 2011). The rationale is that marketing cooperatives allow small farmers to get better, or rather a secured, price by overcoming the "powerful" oligopsonist

Investor- owned firms (IOFs) (Sexton, 1990; Bontems & Fulton, 2009). With marketing cooperatives, farmers have a much better postition for price negociation (Ladd, 1974; Cakir & Balagtas, 2012) and open up access to markets that they cannot access individually (Camanzi et al., 2011). Cooperatives also enable farmers to face uncertainty about agricultural market prices (Jang & Klein, 2011)." (A Theory of Agricultural Marketing Cooperatives with Direct selling/ Maxime Agbo, Damien Rousselire, Julien Salani)

ভারতে ভোগ্যপণ্যের ৬৭% সরবরাহ করে সমবায় সমিতিগুলো। ২০১৯ সালের রিপোর্ট অনুসারে চীনের ৯৫% টাউন ও গ্রামে প্রাথমিক সরবরাহ ও মার্কেটিং সমবায় সমিতি রয়েছে। ভারতের গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ (জিসিএমএম এফ) হলো ভারতের বৃহত্তম খাদ্য পণ্য বিপণন সংস্থা। এটি গুজরাটের দুগ্ধ সমবায়গুলোর শীর্ষ সংগঠন। এটি আমুল এবং সাগর ব্র্যান্ড নামে পণ্যগুলোর একচেটিয়া বিপণন সংস্থা। গত সাড়ে পাঁচ দশকে গুজরাটে দুগ্ধ সমবায় একটি অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে যা ভারতের ১৩ লক্ষ গোয়ালার দুগ্ধ উৎপাদনকারীর দুধ এবং কোটি কোটি গ্রাহকের সাথে ৩৬ লক্ষেরও বেশি গ্রামের দুধ ও দুধজাত পণ্যকে যুক্ত করেছে। নিউজিল্যান্ডের অর্থনীতি তার দুগ্ধশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বের দুগ্ধ উৎপাদনের ২% নিউজিল্যান্ড উৎপাদন করে কিন্তু সেই উৎপাদনের ৯৫% বিদেশে রপ্তানি করে। এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে সমবায় সমিতি। নিউজিল্যান্ডের দুগ্ধশিল্প গত এক শতাব্দী যাবৎ সমবায়ের আওতাধীন রয়েছে। ২০২০ সাল অবধি Fonterra এবং Tatua নামক দুটি সমবায় সমিতি সেদেশের দুধ সংগ্রহ, প্রসেসিং এবং বাজারজাত ব্যবস্থাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। ফন্টেরা সমবায় সমিতি দেশের ৯৬% কাঁচা দুধ সংগ্রহ করতঃ প্রসেস করে। আফ্রিকা মহাদেশে ৪০% লোক সমবায়ের সাথে যুক্ত। সেখানে কৃষকদের তাদের উৎপাদিত পণ্য দেশে এবং বিদেশে বাজারজাতকরণে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে সমবায়। আফ্রিকায় বছরের পর বছর মার্কেটিং সমবায় সমিতিগুলো কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং সেগুলোই সবচেয়ে জনপ্রিয় সমবায় সমিতি। ডেনমার্ক, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশের উৎপাদিত পণ্যেরে স্থানীয়ভাবে ও আন্তর্জাতিক লেভেলে বাজারজাতকরণের কাজটির বড় অংশই সমবায়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে সমবায়ী পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য নানা নামের বহু সংখ্যক সমবায় সমিতি আছে। কেন্দ্রীয়, বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় বিক্রয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি ইত্যাদি বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে দেশে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৬৩৯টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ২৭,৯৭৪ জন। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রদান ও পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মধ্য দিয়ে সদস্য সমিতিসমূহকে সমৃদ্ধিশালী করার লক্ষ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪৭টি। এই সমিতিগুলো প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে। কিন্তু এ ধরনের সমবায় সমিতি যত বেশি সফল হবে, উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে সমবায় তত বেশি কার্যকর হবে। অধিকন্তু উৎপাদনমুখী সমিতিগুলো একতাবদ্ধ প্রয়াস নিলে তাদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করতে পারে এবং পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। কিন্তু এই জায়গাটিতে মারাত্মকভাবে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশের সমবায় বিভাগ। এখানে কাজ করার সুযোগ আছে প্রচুর।

চ. শ্রমিকের উন্নয়নে সমবায়

পৃথিবীতে শিল্পপতি ও জমিদারের সংখ্যা কম, কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সব সম্পদ তাদের হাতে। অন্যদিকে শ্রমিকদের সংখ্য কোটিগুণ বেশি কিন্তু তাদের হাতে তেমন কোনো সম্পদ নেই বললেই চলে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লব পুঁজিপতিদের আরও ধনী করতেছে আর শ্রমিকরা নানবিধ শোষণের শিকারে পরিণত হয়। সেই প্রেক্ষাপটে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে শ্রমিকরা গড়ে তোলে সমবায়ী সংগঠন। ইংল্যান্ডের রচডেলে ১৮৪৪ সালে প্রথম সফল শ্রমিক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় যার নাম রচডেল সোসাইটি অব ইক্যুইটেবল পাইওনিয়ার্স। সদস্য ছিল ২৮ যাদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল তাঁতি। পরবর্তীতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক সমবায় সমিতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সমিতির সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শ্রমিকরা নিজেরাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ ধরনের সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালনা করে থাকে এবং নিজেরা সম্পদের যৌথ মালিকানা লাভ করে। এই সমবায়ী মালিকানা কালেকটিভ ওয়ানারশিপ, কমন ওয়ানারশিপ ইত্যাদি নমে খ্যাত। শিল্পপতি ও ধনী ব্যবসায়ীদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ থেকে বাঁচার উপায় এই শ্রমিক সমবায় সমিতি। ব্রিটেনে এ ধরনের সমবায় সমিতিকে প্রডিউসার সমবায় সমিতিও বলা হয় যা ১৯৭০ সালে দিকে নতুন আন্দোলনের ঢেউ সৃষ্টি করেছিল এবং যোগ দিয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমন ওয়ানারশিপ মুভমেন্টে। ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে শ্রমিক সমবায় সমিতির ভূমিকা খুবই উজ্জ্বল। ফ্রান্সে প্রায় ২,০০০ শ্রমিক সমবায় সমিতি আছে; ইতালিতে এ ধরনের সমবায় সমিতি অনেক। স্পেনের মন্ড্রাগাঁও কো-অপারেটিভ কোঅপারেশন হচ্ছে সফল বৃহত্তম শ্রমিক সমবায় সমিতি। গত শতকের সত্তর ও আশির দশকে যুক্তরাজ্যে শ্রমিক সমবায় সমিতি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিল। লেবার নেতা টনি ব্লেয়ার ছিলেন সক্রিয় সমর্থক। তখন প্রায় ২,০০০ শ্রমিক সমবায় সমিতি ছিল ব্রিটেনে। সুমা হোলফুডস, এসেনসিয়াল ট্রেডিং কোঅপারেটিভ, ইনফিনিটি ফুড কোঅপারেটিভ লিঃ হচ্ছে ব্রিটেন সফল বৃহত্তম কয়েকটি শ্রমিক সমবায় সমিতি। ভেনেজুয়েলায় শ্রমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রচুর। বিগত ২০০৬ সাল নাগাদ সেখানে প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক সমবায় সমিতি ছিল যার সদস্য ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রমিক। শ্রমিকদের ১৬% এইসব সমিতিতে কাজ করতেন।

গবেষণায় দেখা গেছে এ ধরনের সমবায় সমিতির সারভাইভাল মেয়াদ ও হার তুলনামূলকভাবে বেশি এবং দুঃসময়েও টিকে থাকে। তাছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে সামাজিক সংহতি আত্মিক বন্ধন রচনায় এ ধরনের সমিতির সাফল্য অনেক অনেক বেশি। সমিতিগুলোকে পরিস্থিতি অনুসারে নিজেদের আর্থিক কৌশল ও ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ ও পরিবর্তন করে থাকে। অনেক দেশে এ ধরনের সমিতিকে রাষ্ট্র আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। কোনো অর্থনীতিবিদ শ্রমিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে অর্জিত যৌথ মালিকানাকে পৃথিবীর সকল সম্পদে কোনো মানবজাতির উদার সম্মিলিত মালিকানার দিকে এক ধাপ অগ্রগতি বলে অভিহিত করেছেন। "One 1995 study from the US also indicates that "employees who embrace an increased influence and participation in workplace decisions also reported greater job satisfaction"[and a 2019 study in France found that worker- owned businesses "had a positive effect on workers' job satisfaction." One ২০১৯ study indicates that "the impact on the happiness of workers is generally positive". (Wekipedia) বাংলাদেশে শ্রমিকের সংখ্যা প্রচুর। পরিবহণ শ্রমিক, কারখানার শ্রমিক, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির শ্রমিক, রিকশাওয়ালা এবং বিদেশ প্রত্যাগত শ্রমিক। বিদেশ প্রত্যাগত শ্রমিকগণ তাদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় বিনিয়োগ করার সুযোগ পান না। এদের সমবায় সমিতিভুক্ত করা গেলে উজ্জ্বল ফলাফল আসতে পারে।

জ. তৃণমূলে গণতন্ত্রায়ন ও সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নে সমবায়

সমবায়ের গণতান্ত্রিক চারিত্রের দুটি দিক আছে। সকল সদস্যকে নিয়ে সাধারণ পরিষদ এবং সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ বা ব্যবস্থাপনা কমিটি। ব্যবস্থাপনা কমিটি সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে; আর তারা দায়বদ্ধ থাকেন সাধারণ সদস্যদের কাছে। এভাবে সামতির সদস্যগণ প্রত্যেকেই ক্ষমতার অংশীদার হন। তাছাড়া নির্বাচন হয় অবাধ। এভাবেই সাধারণ মানুষ ক্ষমতার অধিকার লাভ করে থাকেন। সাধারণ মানুষ তখনই ক্ষমতার উৎস যখন তারা সচেতনভাবে একতাবদ্ধ। এ কাজটি মূলত গণতন্ত্রের। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা চলে যেতে বাধ্য হওয়ার পরই কেবল উপমহাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু বাংলাদেশ ভূখণ্ডে সেটাও অচিরে উধাও হয়ে যায়। অন্যদিকে সমবায় মানুষকে তৃণমূল স্তরেই গণতন্ত্রের স্বাদ ও সাফল্য দিয়ে এসেছে ব্রিটিশ আমল থেকেই। সমবায় সমিতি পরিচালিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং সেই পরিচালনার কাজটিও হয় নিজেদের সুলিখিত ও বিধিবদ্ধ সংবিধান বা উপ-আইন অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি সমবায় সমিতি হচ্ছে এক একটি ক্ষুদ্র গণতন্ত্র বা Mini Democracy। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের তৃণমূলায়ন। এটা হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র (Quality Democracy)। এই গণতন্ত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীদের চরিত্র হননের , ক্ষমতায় গিয়ে তাদেরকে হেনস্থা করার কিংবা ধ্বংস করার ব্যাপার থাকে না। এই গণতন্ত্রে উদার পরিবেশে বিরাজমান থাকে। নির্বাচিত হওয়ার পর সবাই আবার মিলেমিশে সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সাধারণ মানুষের, পিছিয়ে পড়া মানুষের সুপ্ত ও মানুষের অব্যবহৃত ক্ষমতার উদ্বোধন ঘটে সমবায় সমিতির মাধ্যমে। তারা আপনা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবেত হয়ে নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজেদের দ্বারা নিজেদের নেতৃত্বে নিজেদের সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটায়। ভূপেন হাজারিকার গাওয়া একটি বিখ্যাত গানে বৃহত্তর সমাজের মানুষের অবস্থা তুলে ধরে বলা হয়েছে, "ব্যক্তি যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্বরহিত/তবে শিথিল সমাজকে ভাঙ্গো না কেন!" সমবায় হচ্ছে ব্যক্তিকে তার আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থপরতার খোয়াড় থেকে বের করে আনার এবং ব্যক্তিত্বরহিত সমষ্টিকে প্রবল ব্যক্তিত্বে জাগিয়ে তোলার মোক্ষম মন্ত্র। সমবায় সমিতিই হচ্ছে 'জ্ঞানবিহীন নিরক্ষরের খাদ্যবিহীন নাগরিকের নেতৃবিহীনতার মৌনতা' ভাঙার অব্যর্থ অস্ত্র। সমবায়ই সফলভাবে শেখাতে পারে : 'আমরা দুর্বল নই, আমরা পারি'। পৃথিবীতে যখন রাজনৈতিক গণতন্ত্র আজকের উন্নত মানে পৌঁছায়নি, তখন সমবায় সমিতিগুলো পরিচালিত হতো ষোলোআনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সমবায় মানুষকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা করতে এবং সেসবের প্রতি আস্থাশীল হতে শেখায়।

ঝ. নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়

যদি পৃথিবীর জনগোষ্ঠীকে সর্বজনীনভাবে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, তবে তা হবে পুরুষ এবং নারী। সকল দেশেই সকল কালেই নারীরা পুরুষদের দ্বারা শাসিত, শোষিত ও নিপীড়ত হয়েছে। এখনও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। কোথাও কোথাও নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে কিন্তু কোথাও পুরুষ ও নারীর ক্ষমতা সমান সমান হয়নি আজও। কী রাষ্ট্রক্ষমতা, কী সম্পদের মালিকানা, সবখানেই পুরুষের প্রাধান্য রয়ে গেছে। পৃথিবীর পরিবারগুলো এখনও কমবেশি পুরুষতান্ত্রিক। প্রচার মাধ্যম, শিল্পসাহিত্য সবকিছুতেই পুরুষতন্ত্রের দাপট বিরাজমান। তবে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে নারীরা আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারেন এবং বাস্তবে তা ঘটে আসছে। পৃথিবীর বহু দেশেই মহিলা সমবায় সমিতিগুলো নারীর ক্ষমতায়নে সফল ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নারী-পুরুষের সম্মিলিত সমবায় সমিতিগুলোতে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটে না বললেই চলে। সেসব সমিতিতে পুরুষদেরই হাতে পরিচালনা ক্ষমতা থাকে এবং তারাই সমবায়ের সিংহভাগ সুবিধা কুক্ষিগত করে নেয়। বিষয়টি ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অ্যালায়েন্স (ICA) এর গোচরীভুক্ত হলে ১৯৯৫ সালে উক্ত সংস্থা সমবায় সমিতিতে লৈঙ্গিক সমতা বা জেন্ডার প্যারিটি নিশ্চিতকরণের ওপর জোর দিয়ে রেজুলেশন করে। সেটির নাম দেওয়া হয় "Gender Equality in Cooperatives"। আইএলও তার ২০০২ সালের ১৯৩ নম্বর সুপারিশে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে : "special consideration should be given to increasing women's participation in the cooperative movement at all levels, particularly at management and leadership level"

আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডেম পলিন গ্রীন ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর এক বাণীতে বলেছিলেন, "Cooperative businesses have done so much to help women on to the ladder of economic activity. With that comes community respect, political legitimacy and influence."

জাপানের বৃহত্তম কনজুমার সমবায় সমিতির নাম জাপান কনজুমার্স কো-অপারেটিভস ইউনিয়ন। এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১.৫০ কোটি যার অধিকাংশই মহিলা। পৃথিবীর ২৫% মানুষ বাস করে চীনে। চীনের গ্রামীণ মানুষের ৭৫% ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস পায় না। তাদেরকে আর্থিক সেবা দেওয়ার জন্য সেদেশের রুরাল ক্রেডিট কোঅপারেটিভগুলোকে জোরদার করার চেষ্টা চলছে। ভারতে হোয়াইট রিভ্যুলুশন সৃষ্টিকারী গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ এর আওতাধীন গরু পালনকারী বা গোয়ালা সমবায় সমিতিগুলোর বেশিরভাগই মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। আসলে ভারতে সাদা বিপ্লব এনেছে গুজরাটের সমবায়ী নারীরা। সেখানকার ভিলেজ ডেইরি কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলো মূলত নারী সমবায়ীদের কর্মযজ্ঞের স্থান। বর্তমানে সেখানে ৫,১২৫ টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি নারীদের দ্বারা পরিচালিত। আর যেসব সমিতি পুরুষদের নামে নিবন্ধিত সেসব সমিতিতে কাজ করেন মূলতই নারীরা। এতে করে সেখানকার গ্রামীণ নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। তারা আর পুরুষের অনুগ্রহের পাত্রী নন। ভারতের মাদুরাই কামরাজ ইউনিভার্সিটির স্কুল অব ইকোনোমিক্সের সহকারী অধ্যাপক ড. টি রামানাথন এবং গবেষণা স্কলার জে. রাজকুমার তাদের 'Role of Co- operatives in Empowering Rural Women' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে যুক্তিসহকারে সুপারিশ করে বলেছেন,

"Women are the focus of attention of all International and National development programmes. Efforts have been directed at empowering them in all fields of activity. Cooperative institutions at the present scenario hold enormous potential for the development of women and more particularly the rural women. Rural women are actively involved in the process of food production, processing and marketing. They often lack the legal status which prohibits them to have access to credit, education and technology. Co- operative institutions can help to accelerate the process of development and participation of women in their organisational and business activities. Institutions like the International Cooperative Alliance (ICA) with the support of other international organizations and national level institutions

can develop and sponsor programmes which are aimed at improving the lot of rural women. Hence, it is needless to say that co- operatives are playing a very important role in the empowerment of rural women through various schemes."

আজ সারাদেশে এবং দেশের বাইরেও বাংলাদেশের নারীর জয়জয়কার। তবে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা গ্রামের অশিক্ষিত মায়েদের মতোই যা অগোচরে রয়ে যায় সুধীমহলের, উন্নয়ন-গবেষকদের। সমবায় সমিতিগুলো অশিক্ষিত-আধাশিক্ষিত নারীদের প্রচলিত প্রথাবদ্ধ অচলায়তনের বাইরে এনে নানা পেশায় ও ব্যবসায় সম্পৃক্ত করছে। তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের চেয়ে বেশি ঘটছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস-আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা। 'বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি একজন গোলাপ বানু তারই উজ্জ্বলতম উদাহরণ। এমন কত গোলাপ বানু তৈরি হচ্ছে দেশের আনাচকানাচে! পেছনে কাজ করছে হাজারো সমবায় সমিতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ের নারীর দুরবস্থাকে পুরুষের নানামুখী ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবে দেখেছিলেন এবং তা থেকে উত্তরণের পথ না দেখে হতাশ হয়ে বলেছিলেন, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা?' নারীকে তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার এনে দিয়েছে শিক্ষা ও সমবায়। সমবায় সমিতিগুলো নারী শিক্ষা নিশ্চিতকরণেও সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশে মহিলাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং তাদের সকল স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে মহিলা সমবায় সমিতি। জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক মহিলা সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক বিআরডিবিভুক্ত মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারাদেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯২,০২০টি এবং মোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৫,০৯,৮২৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য সংখ্যা ৮৮,৩৮,৫৯৬ জন এবং মহিলা সদস্য সংখ্যা ২৬,৭১,২২৯ জন। মোট সমবায় সমিতির মধ্যে শুধুমাত্র মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে ২৭,৩৮৮টি। এসব মহিলা সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৯,৭২,৩৪৯ জন। তাছড়া বর্তমানে ৩৯টি কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি আছে। হরিদাস ঠাকুর সম্পাদিত 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় গবেষণা' গ্রন্থটি পাঠ করলে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের কার্যকারিতা।তাতে দেখা গেছে সমবায়ী নারীদের মধ্যে ৬০% অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উদগ্রীব, ৯৯% নারী সম্মানিত হতে চান, ৯৬% নারী ব্যবসা অথবা কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, ৯৯% নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেড়েছে, ১০৭ মহিলা সমবায় সমিতির মধ্যে ৪৫টি মহিলা সমবায় সমিতি থেকে স্থানীয়/জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৫৮% নারী বিজয়ী হয়েছেন; ৯৮% স্বাস্থ্যজ্ঞান বেড়েছে ; ৯৯% নারী মনে করেন তারা আর 'অবহেলিত' নন এবং বিবাহিত নারীরা আর্থ-সামাজিকভাবে স্বনির্ভর ও সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে বেশি আকাঙ্ক্ষী। দেখা যাচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা যতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে তাদের অধিকার সচেতনতা, আত্মসম্মানবোধ এবং পুরুষের সমান্তরালে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

ঞ. ভালোবাসার সংস্কৃতি গড়ে তোলায় সমবায়

সমবায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা (ICA) বলেছে, 'A cooperative (also known as co- operative, co- op, or coop) is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly- owned enterprise.'

আইসিএ প্রদত্ত সংজ্ঞায় সমবায়ের ৩ ধরনের লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক। একথা অতিশয়োক্তির মতো শোনাবে তবু সত্য যে সমবায় হচ্ছে এক ধরনের জীবনপ্রণালি। সমবায় শেখায় সততা, উদার নৈতিকতা, একতা, সক্রিয় সহমর্মিতাবোধ, গণতন্ত্রের নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের অংশগ্রহণের অভ্যাস, সম্মিলিতভাবে ভালো থাকার ভাবনাচিন্তা ও অভ্যাস, ত্যাগী মনোভাব , যূথবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার পাঠ ও কৌশল প্রভৃতি। আর এসব চর্চা করতে করতে রচিত হয় ভালোবাসাভিত্তিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। সাধারণ সদস্যদের জন্য নির্বাচিত নেতৃত্বের আলোকিত ভালোবাসা এবং নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ সদস্যদের সচেতন সমর্থন সমবায়ে প্রাণশক্তি সরবরাহ করে। ভালোবাসার বন্ধন হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত বন্ধন। এটা সমবায়ী ঐক্যেরও মূলে কাজ করে ভালোবাসার বন্ধন। সমবায় হচ্ছে ভালোবাসা-নির্ভর, ভালোবাসা-কেন্দ্রিক, ভালোবাসা-চালিত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পদ্ধতি। যেখানে পারস্পরিক উদার ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নেই, সেখানে আর যাই থাক, সমবায় অনুপস্থিত। সমবায়ের বন্ধন মানেই ভালোবাসার বন্ধন। সমবায়ের মূল পুঁজি সমবেত ভালোবাসা। সেজন্য মানবতার কবি তাঁর সমবায়-সংগীতে বলেছেন, "মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে/ মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে।" দীর্ঘমেয়াদে সফল প্রতিটি সমবায় সমিতি হচ্ছে সেই 'মিলনের নিখিল', সে ধরনের প্রতিটি সমবায় সমিতির টিকে থাকার রজ্জু হচ্ছে পারস্পরিক উদার ভালোবাসা। এই ভালোবাসা অসাধ্য সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে ও সাফল্য লাভে শক্তি জোগাতে পারে। ভারতের বিখ্যাত গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ নিজেদের সমবায়ী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। সমিতিবদ্ধ খামারী বা গোয়ালারা একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে বলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের চেষ্টা তাদের কাছে পরাজিত হয়েছে একাধিকবার। তাদের সাফল্যে রচিত হয়েছে শ্বেতবিপ্লব বা হোয়াইট রেভ্যুলেশন। ভারতের প্রখ্যাত সিনেমা পরিচালক শ্যাম বেনেগাল ১৯৭৬ সালে সাদা বিপ্লব নিয়ে ' মন্থন' (Manthan) নামে ছবি তৈরি করেছিলিন। ছবিটির খরচ জোগাতে পাঁচ লক্ষ গোয়ালা প্রত্যেকে ২ রুপি করে চাঁদা দিয়েছিলেন। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর সমিতির সদস্যগণ খোলা ট্রাকে চড়ে প্রেক্ষাগৃহে দেখতে যেতেন দলে দলে। এতে করে ছবিটি ব্যবসায়িকভাবেও সাফল্য অর্জন করে। ছবিটি ১৯৮৭ সালে ভারতীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। ব্রাজিল হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমবায়ী দেশ। সেদেশের মানুষ সমবায়ী সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। ব্রাজিলের মানুষ সমবায়ী মূল্যবোধে গভীরভাবে অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী। সেজন্য সেখানে স্থানীয় ও অভিবাসী মানুষের মদ্যে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক বিরাজমান বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। ডেনমার্কের কিছু কিছু সমবায় সমিতির সদস্যগণ সমবায়ী জীবনযাপনের মাধ্যমে সমবায়ী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। ৭০ ও ৮০ দশকে কালেকটিভ লাইফ স্টাইল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একসাথে কৃষিকাজ করা, ব্যবসা করা, অভিন্ন আবাসন এলাকায় বসবাস করা এবং গ্রাম এলাকার পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয়ভাবে সচেতন ভূমিকা পালন করা এসব সমিতির সদস্যদের মূল কাজ। এ ধরনের সবচেয়ে ভবিখ্যাত সমিতিটি কোপেনহেগেনে অবস্থিত, নাম হচ্ছে ফ্রিটাউন খ্রিস্টিয়ানা কোপেনহেগেন। এ ধরনের সমবায়ীদের বলা হয় 'Co-housing groups। ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সমবায়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক ভূমিকা লক্ষ্য করে 'Social Co- operatives' নামক আলাদা ধরনের সমবায় সমিতির প্রচলন করা হয়েছে। এ ধরনের সমিতির লক্ষ্য যতটা না অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক, তারচেয়ে বেশি সামাজিক সাংস্কৃতিক। সামাজিক সংহতি বা Social Integration হচ্ছে এ ধরনের সমিতির মূল লক্ষ্য এবং তা দীর্ঘমেয়াদি। আবার স্থানীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও সমবায় ব্যবস্থাকে ইতিবাচক নেতিবাচক

উভয়ভাবে প্রভাবিত করে থাকে। ঢাকা ক্রেডিট, ঢাকা মেট্রোপলিটান খ্রিশ্চান হাউজিং কোঅপারেটিভ প্রভৃতির কার্যক্রমের ভেতর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক রয়েছে। ঢাকা ক্রেডিট স্থানীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে সামাজিক সংহতি এবং সাংস্কৃতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে অনেকখানি সমর্থ হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় সমবায়ী ভালোবাসার বাণীচিত্র দেখতে পাই :

আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই
সকলের সুখ সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার,
যদি না সবারে অংশ দিতে আমি পাই।
সকলের সাথে বন্ধু সকলের সাথে
যাইব কাহারে বলো, ফেলিয়া পশ্চাতে।
ভাইটি আমার সে তো ভাইট আমার।
নিয়ে যদি নাহি পারি হতে অগ্রসর,
সে আমার দুর্বলতা, শক্তি সে তো নয়।
সবাই আপন হেথা কে আমার পর?
হৃদয়ের যোগ সে কি কভু ছিন্ন হয়?
একসাথে বাঁচি আর একসাথে মরি,
এসো বন্ধু, এ জীবন সুমধুর করি।

কবিতায় বর্ণিত এই ভালোবাসাই হচ্ছে সমবায়ী ভালোবাসা। এই ‘ সকলের সুখ’ হচ্ছে সমবায়ী সুখ। এই ‘ হৃদয়ের যোগ’ হচ্ছে সমবায়ী বন্ধন। এই আলোই হচ্ছে সমবায়ী আলো। সমবায় সমিতির নির্বাচিত নেতৃত্বের কাজ হচ্ছে সমিতির “ সকলের সুখ”, “সকলের আলো” নিশ্চিত করা; বৃদ্ধি করা। তারা ব্যক্তিস্বার্থে সমিতির সম্পদ বা সুনাম ব্যবহার করবেন না। তারা সমিতিকে বা সমিতির সম্পদ ‘‘কুক্ষিগত’’ করবেন না। তারা ছলেবলে কিংবা মামলা মোকদ্দমার আশ্রয় নিয়ে সমিতির ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করবেন না। সমবায়ী গণতন্ত্র মানেই ভালোবাসাভিত্তিক গণতন্ত্র। এটাই সমবায়ী সংস্কৃতি। যেখানে এই সংস্কৃতি বেগবান ও অক্ষুণ্ণ থাকে, সেখানে সমবায় সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগে। সেজন্যই ১৯৯৯ সালে চীনে আইসিএ আয়োজিত সমবায় মন্ত্রীদের সম্মেলনের রেজুলেশনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছিল : “Co- operatives contribute their best to society when they are true to their nature as autonomous, member-controlled institutions, and when they remain true to their values and principles (autonomy and independence).” সমবায়ী সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং তাকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার ওপর জোর দিতে হবে। কেবল নির্বাচন আর নিরীক্ষা কোনো সমবায়কে স্থায়ী ব্যঞ্জনায় সফল ও সার্থক করে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। বিষয়টি সমবায়ীদের বুঝতে হবে; সমানভাবে বুঝতে হবে সমবায় বিভাগের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও। সমবায় সমিতি শুধুমাত্র কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠান নয়, এটা একইসঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুষ্টিসাধনের সংগঠনও, এই সমবায়ী সত্যে সমবায়কে বুঝতে হবে, ধারণ করতে হবে, দৃষ্টি-নির্দেশনা ও গতিদান করতে হবে। তার সাথে অবশ্যই রাজনৈতিক দলবাজি থেকে সমবায় সমিতিকে দূরে রাখতে হবে। এসবের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার আলোকে ‘বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ’ নামক সমবায় সমিতিভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ এখন মারাত্মকভাবে বিভক্ত ও বিভাজিত। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক মতবিশ্বাসে সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা প্রায় প্রতিকারহীন বিভাজন, অশ্রদ্ধা ও অসহনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে শহর থেকে গ্রাম সবখানে। উল্লিখিত পাইলট প্রকল্পটি সার্থকতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সামাজিক সংহতি ও সাংস্কৃতিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য বেশি করে সমবায়ী ভালোবাসার দর্শন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বাংলাদেশের গ্রামগুলো একসময় ছিল পারস্পরিক ভালোবাসার রাজধানী। সেটা লক্ষ করে সেই গ্রামবাংলার কবি জসীমউদদীন একসময় গর্বভরে লিখেছিলেন,

‘মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভাইয়ের স্নেহের ছায়
তুমি যাবে ভাই—যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়।’
(নিমন্ত্রণ/ জসীমউদদীন)

বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ প্রকল্পকে স্থায়ী ব্যঞ্জনায় সফলভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলোতে এমন সামাজিক সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে; এবং তা সম্ভব হতে পারে কেবল সমবায়ের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লব বাস্তবায়নের জন্যে বহুমুখী গ্রাম সমবায় সমিতিকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন হবে একতার, ঐক্যবদ্ধতার। দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যে সেই ঐক্যবদ্ধতার দর্শন ছিল যার জন্য তিনি প্রকৃষ্ট পন্থা হিসেবে সমবায়কে নির্বাচিত করেছিলেন। সমবায়ের পথই তো একতার পথ; ঐক্যবদ্ধতার পথ। সমবায়ের বিপরীত প্রান্তে রয়েছে বিভাজন। বিপরীত প্রান্তে বিভেদ। বিপরীত প্রান্তে দ্বন্দ্ব।বিপরীত প্রান্তে প্রেমহীনতা। ‘বঙ্গবন্ধু মডেল’ ভিলেজ প্রকল্পটিকে সমবায়ী ভালোবাসার সংস্কৃতি নিশ্চিত করেই বাস্তবায়ন করতে হবে বলে আমার মনে হয়।

৪. বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সমবায়ের প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান বিশ্ব মূলত অর্থনীতি শাসিত। মুক্তবাজার মানেই অর্থনীতির শাসন। বিশ্বায়নের মাঝে সামাজিক সাংস্কৃতিক এজেন্ডা আছে। ধর্মীয় এজেন্ডা থাকাও অসম্ভব নয়। তবে মূল চালিকাশক্তি অর্থনীতি। সমবায় যদিও বহুবিধ উপাদান ধারণ করে, তবু তার মূলে আছে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভাবনা। আজ সারাবিশ্বে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে সে সম্পর্কে এবং তার সর্বমুখী ও সর্বগামী প্রভাব ও কুপ্রভাব সম্পর্কে সমবায়ী এবং সমবায় ভাবুক-চিন্তক ও সমবায়কর্মীদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। যারা পলিসি মেকার, এ বিষয়ে তাদের আরও বেশি অবহিত ও সচেতন থাকার আবশ্যকতা রয়েছে। এত করে তারা সময়, দেশ, সমাজ, স্থান বিশেষে সমবায়কে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো করে নিতে পারবেন। যেখানে যতটুকু পরিবর্তন দরকার, সেখানে ততটুকু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন। সমবায়ের কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। কারণ ক্রাইসিসে বিপাকে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সময় সমবায়ী অর্থনীতি টিকে থাকে সফলতাসহ। স্পেনের মন্ড্রাগাঁও কর্পোরেশন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিশ্বে ২০০৭—২০১২ মেয়াদে যে অর্থনৈতিক ক্রাইসিস সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল ভয়ংকর : “The 2007-2012 global economic crisis described as ‘The Mother of All Crises’ with substantial wealth destruction for most people.” কিন্তু সেই ক্রাইসিসেও সমবায়ী সংগঠনগুলো তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ইউরোপের সমবায় ব্যাংকগুলো নিজেদেরে অক্ষত রাখতে সমর্থ হয়েছিল। সেই সময়ের পরিস্থিতিরি মূল্যায়ন করে Capital and the Debt Trap নামক গবেষণা পত্রিকা বলেছিল, “Cooperatives, by contrast, have fewer problems with perverse incentives, because their ownership and control structures follow legal mandates promoted by the International Co- operative Alliance. These generally involve many more people in critical decisions.” “Co- operatives tend to have a longer life than other types of enterprise, and thus a higher level of entrepreneurial sustainability. In [one study], the rate of survival of cooperatives after three

years was 75 percent, whereas it was only 48 percent for all enterprises … [and] after ten years, 44 percent of cooperatives were still in operation, whereas the ratio was only 20 percent for all enterprises.” (Internet)

আসলে বিপাকে ক্রাইসিসে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সময় সমবায়ী অর্থনীতি টিকে থাকে সফলতাসহ। স্পেনের মন্ড্রাগাঁও সমবায় ফেডারেশন তার একটি প্রকৃষ্ট বৈশ্বিক উদাহরণ। এটি স্পেনে ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অদ্যাবধি সকল বিপাকে ক্রাইসিসে সাফল্যের সাথে টিকে থেকেছে এবং আজও সেই অবস্থা বিরাজমান।

সমবায়ের ইতিহাস বলে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক ছিল এবং রয়েছে সমবায়ের। উনিশ শতকে ইউরোপে যে সামাজিক সাংস্কৃতিক, জনসংখ্যাগত এবং বিশেষত শিল্পবিপ্লবজনিত পরিবর্তন ঘটেছিল, তার ধাক্কা সামাল দিতেই আধুনিক সমবায় ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছিল। শিল্প শ্রমিক, ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাদের আর্থ-সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং তার উন্নয়নের জন্য যূথবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করেছিলেন। সমাজতন্ত্রের পতনের পর আজকের বিশ্ব বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার নিয়ন্ত্রিত। মুক্তবাজার মানেই একচেটিয়া পুঁজিবাদের রাজত্ব এবং সর্বত্র অসম প্রতিযোগিতা। আজ বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র কৃষকরা মারাত্মকভাবে অসম প্রতিযোগিতার মুখে। তার সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে জনসংখ্যা এবং নানাবিধ প্রযুক্তির ব্যবহার। এ প্রেক্ষোপটে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে এবং একইসঙ্গে সমবায়ের কৌশলগত ও নীতিগত দিকসমূহ নতুন পরিস্থিতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ করে রিডিজাইন করার প্রয়োজনীয়তার কথাও উচ্চারিত হচ্ছে।

‘Today, working together in co- operatives is a reaction to demographic change. In industrialized countries, change is expressed by low birth rates, an increasing number of old people living longer, rural-urban migration; reduced private and public services and infrastructure in rural areas. In developing countries, signs of change are high birth rates, increased mobility, social and political unrests, urbanization and migration, and poverty partly caused by climate change.

Local and regional businesses are increasingly exposed to economic change, facing competition by international combines and global players. Stationary trade and crafts are challenged by the mobility of on- line trade. Rural exodus is forcing village stores, pubs and other facilities to close down, deteriorating the living conditions of rural areas.

Technological change in form of new production, transport and information technologies, new sources of energy, new media are causing a revolution in production of goods and services and in communication.

Local versus global: Today, working together in co- operatives offers an alternative to an increasingly global economy, characterized by high mobility of ideas, capital and labour. Co- operatives can strengthen their position by emphasizing their local and regional roots and their closeness to members, linked with vertically integrated co- operative networks, allowing to combine the advantages of local presence with the advantages of economies of scale (small in front — big in the back, Rabobank).’ (How Co- operative are Social Co-operatives? / Hans- H. Mnkner)

তার মানে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিবর্তনের পথ ধরে সমবায়ী ভাবনার ক্ষেত্রেও কৌশলগত পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেছে। কালের যাত্রার ধ্বনি সবাইকে শুনতে হয়। সমবায়-বিশেষজ্ঞ ও চিন্তকদের ক্ষেত্রেও সেকথা একইভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশের সমবায় বিভাগে কিছুদিন কাজ করে এবং একইসঙ্গে সমবায়ের আন্তর্জাতিক অঙ্গন খোঁজখবর নিয়ে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় হচ্ছে সবচেয়ে জুতসই উন্নয়ন পদ্ধতি। আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সমিতির স্থানে একই ধরনের সমিতি নিয়ে বড় ধরনের সমবায়ী ফেডারেশন করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্রাকৃতির সমিতির পক্ষে এখনকার বিশ্বায়নকবলিত অবারিত মুক্তবাজারে সাফল্যের সাথে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। সমবায়ের আইন ও বিধিমালা জানতে হবে অবশ্যই; তার সাথে বুঝতে হবে, শিখতে হবে, অনুসরণ করতে হবে পারস্পরিক উদার ভালোবাসাভিত্তিক সমবায়ী গণতন্ত্র তথা সমবায়ী সংস্কৃতি। সমবায়ী নেতৃত্বের সততা ও দূরদর্শিতা, সাধারণ সদস্যদের সমবায়ী জ্ঞান ও সচেতন সক্রিয়তা, চলমান অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে সমবায়ী নেতৃত্বের হালনাগাদ জ্ঞান প্রভৃতি সমবায়ের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। নিবন্ধন-পূর্ব মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণে এসকল বিষয় যথাযথ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা প্রয়োজন। সমবায় সমিতির দীর্ঘস্থায়ী সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসেবে আছে আরও দুটি বিষয় : রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ মুক্ত স্বাধীন কাজ করার পরিবেশ এবং সমবায়ী নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক সততা ও সহমর্মী নিষ্ঠা। বাংলাদেশে সমবায়কে বাস্তবে এগিয়ে নিতে হলে এই কয়েকটি স্থানেই ব্যাপক উন্নতি করতে হবে।

আমিনুল ইসলাম : কবি-গবেষক ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও কৃষি সমবায়ের সাফল্যগাথা

ড. জাহাঙ্গীর আলম

সমবায় হচ্ছে অংশগ্রহণকারী জনগণের স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত সংগঠন। এর সদস্যগণ যৌথভাবে পরিচালিত সম্পদ ও শ্রমের ভিত্তিতে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মিলিত স্বার্থে কাজ করে থাকে। সমবায় মালিকানায় সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হয়। এটি পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। কর্মসম্পাদনে স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতা সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। সমবায়ের সদস্যগণ নিজেরা উৎপাদন করে, ভোগ করে ও বিপণনে অংশগ্রহণ করে। সমবায়ের মাধ্যমে ছোট উদ্যোগগুলো লাভজনক হয়ে ওঠে এবং বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এর অংশীজন বেশি হলে প্রতি ইউনিট উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়। বাজারে দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাতে ভালো মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থা যখন মানসম্পন্ন পণ্য ন্যায্যমূল্যে প্রদানে ব্যর্থ হয় তখন সমবায় এর প্রতিকার হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বিস্তৃত করা। এছাড়া সামাজিক উন্নয়ন, কর্ম সৃজন ও দারিদ্র্য মোচনে সমবায় হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বাংলাদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সংগঠন গড়ে ওঠেছে। এদের মধ্যে রয়েছে উপযোগমূলক সেবা, ভোগ্যপণ্য, শ্রম, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা সেবা, শিল্প, গৃহায়ন, সঞ্চয় ও ঋণ প্রদান, বিমা এবং কৃষি উৎপাদন ও বিপণন সম্পর্কিত সমবায়। তন্মধ্যে কৃষি উৎপাদন ও বিপণন বিষয়ক সমবায়ের পরিধি অনেক বিস্তৃত। অংশীজনের সাফল্য খুবই দৃশ্যমান।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৩ ধরনের সমবায় ব্যবস্থা

পরিলক্ষিত হয়। এক. সমাজতান্ত্রিক সমবায়; দুই. ধনতান্ত্রিক বা বিশেষ ধরনের ব্যবসায়িক সমবায়; এবং তিন. অর্থনৈতিক তৃতীয় খাত হিসেবে পরিচালিত সমবায়। সমাজতান্ত্রিক সমবায় মূলত রাষ্ট্রের নীতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কার্যসম্প্রদানের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। এক্ষেত্রে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানাকে যৌথ মালিকানায় রূপান্তর করা হয়। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং উৎপাদনে ও বণ্টনে বিধিবদ্ধভাবে অংশগ্রহণের নিমিত্তে পরিচালিত হয় এই সমবায়। তবে নব্বই-এর দশকের পর থেকে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে এ সমবায় ব্যবস্থা ক্রমেই শিথিল হয়ে আসে, কিন্তু এখনো তার কিয়দংশ অবশিষ্ট আছে। বিশেষ ধরনের ব্যবসায়িক সমবায় সংগঠনের প্রকৃতি হলো ধনতান্ত্রিক। বাজারে প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করার জন্য এরূপ সংগঠনের উদ্ভব। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের সেবা প্রদান করা, উৎপাদন ও বিপণনের ব্যয় সংকোচন করা এবং ব্যবসায়িক মুনাফা বৃদ্ধি করা। তৃতীয় খাত হিসেবে বিবেচিত সমবায় সংগঠনগুলো মিশ্র অর্থনীতি অনুসরণ করে থাকে। এগুলো ব্যক্তি বা সরকারি উদ্যোগ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এগুলো পরিচালিত হয় সমবায়ের নীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে।

স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। সংবিধানের চারটি স্তরের অন্যতম ছিল সমাজতন্ত্র। ওই দলিলের ১৩ নং অনুচ্ছেদে দেশের সম্পত্তির তিন ধরনের মালিকানা উল্লেখ করা হয়। তার একটি রাষ্ট্রীয়, একটি ব্যক্তিগত এবং অপরটি সমবায়ী মালিকানা। সমবায়ের পথ ধরে তিনি ধনী নির্ধনে বৈষম্য পরিহার করে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের কথা বলেছেন। বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায়সংগত মূল্য প্রদানের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমবায়। তাতে জমি একত্রীকরণের মাধ্যমে আধুনিক চাষাবাদ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের প্রত্যাশা ছিল তার। তবে তিনি জমি জাতীয়করণের কথা বলেননি। দেশের কৃষকদের জন্য তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল। তিনি ছিলেন একজন কৃষকদরদি নেতা। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রয়োগবাদি। তিনি বলেছেন, "গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। ভুল করবেন না আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব তা নয়। এ জমির মালিকের জমি থাকবে। ...আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে। অংশ যাবে গভার্ণমেন্টের হাতে।" গ্রাম সমবায়ের রূপরেখা বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু আরও বলেছেন, "রাষ্ট্র তোমাকে ঋণ দেবে, টাকা দেবে, ইনপুটস দেবে, তোমাকে সেচের ব্যবস্থা করে দেবে। সেটা করে দেবে তুমি যদি এই ধরনের সমবায় কর। সমবায়ের ফল দিয়ে যে উৎপাদনশীলতা বাড়বে তার সুফলটা যেমন পাবে জমির মালিক তেমনি এটার অংশ পাবে যারা ভূমিহীন কৃষক, যারা ওখানে শ্রম দেবে তারা। যারা এখানে বিনিয়োগ করবে, তারাও এখানকার একটা অংশ পাবে।" এভাবে তিনি নিজস্ব পন্থায় একটি আধুনিক কৃষি সমবায়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমবায়ের পরিকল্পনা আর বাস্তব রূপ নেয়নি। তবে তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন থেমে থাকেনি। আপন গতিতে এগিয়ে গেছে কৃষি সমবায়। বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রয়েছে এর অনেক সাফল্য গাথা।

কৃষি মানুষের সবচেয়ে পুরানো পেশা। সমবায়েরও আদি রূপ কৃষি সমবায়। এর মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে কৃষক ফসলহানির সংকট কাটিয়েছে, কৃষিতে অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে, উপকরণ সহায়তা নিয়েছে, উৎপাদনে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং পণ্য বিপণনে সফলতা পেয়েছে। তাতে কৃষকদের জন্য লাভজনক হয়েছে কৃষির উৎপাদন। কৃষি সমবায়গুলোর মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ হ্রাস;
- ঝুঁকি উপশমিত করা;
- প্রতিযোগিতামূলক পণ্যবাজারে প্রবেশের সক্ষমতা অর্জন;
- বিভিন্ন কৃষি উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা প্রাপ্তি;
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস;
- কৃষি ব্যবসায় লাভজনকতা বৃদ্ধি করা; এবং
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

কৃষিকাজ বলতে বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ফসল ফলানো, খাদ্যশস্য উৎপাদন, পশুপাখি পালন, মাংস, দুগ্ধ ও ডিম উৎপাদন, মৎস্য চাষ, কৃষি বনায়ন ইত্যাদি সমষ্টিকে বুঝায়। এ বিশাল কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে সমবায়। এদের মধ্যে শস্য উৎপাদন ও বিপণন সমবায়, দুগ্ধ সমবায়, মৎস্য চাষি সমবায়, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সমবায়, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের সমবায়ের ক্ষেত্রে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, ডেনমার্ক, ভারত ও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ সকল দেশে সমবায়ের বার্ষিক আয় পর্যাপ্ত। অংশীজনের সংখ্যাও অনেক বেশি। জাতীয় উৎপাদনে ও কর্ম সৃজনে দীর্ঘকাল ধরে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে কৃষি সমবায়। নিম্নে তার কিছু বিবরণ পেশ করা হলো।

জাতীয় কৃষি সমবায় ফেডারেশন জাপানের এবং সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে বড় কৃষি সমবায় সংগঠন হিসেবে বিবেচিত। এর প্রধান দপ্তর টোকিওতে অবস্থিত। ১৯৭২ সালের ৩০ মার্চ থেকে এর যাত্রা। বর্তমানে এর বার্ষিক আয় ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কৃষি খামারগুলোর অর্থনৈতিক মান বৃদ্ধি করা, বাজার ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের পাশ কাটিয়ে কৃষকদের জন্য পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, কৃষি উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধন সংগ্রহে সহায়তা করা উক্ত সমবায় সংগঠনের কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। জাপানের হকাইডুতে প্রতিষ্ঠিত হকুরেন কৃষি সমবায় ফেডারেশন আর একটি উল্লেখযোগ্য সমবায় সংগঠন, যার বার্ষিক আয় ১৩.৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সংগঠনটি কৃষকদেরকে উৎপাদনে ও বিপণনে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং চাষাবাদের মূলধন সরবরাহ করা এ সংগঠনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। জাপানি সয়াবিন, চাল, শাকসবজি, ফলমূল, গরুর দুধ এবং দই বাজারজাতকরণে সংগঠনটি বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় কৃষি সমবায় ফেডারেশন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষি সমবায় সংগঠন হিসেবে পরিচিত। এর বার্ষিক আয় ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৬১ সালের ১৫ আগস্ট এর প্রতিষ্ঠা। ১ হাজার ১৫৫ সমবায় সমিতি এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত। এর সদস্য সংখ্যা ২.৪ মিলিয়ন। কৃষকদেরকে উৎপাদনে ও বিপণনে সহায়তা দেয়া এই সংগঠনটির প্রধান উদ্দেশ্য।

যুক্তরাজ্যের মিনিসোটায় প্রতিষ্ঠিত কৃষি ব্যবসা সমবায় সংগঠন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। এর বার্ষিক আয় ৩১.৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর কর্মচারীর সংখ্যা ১০ হাজার ৪৫৫ জন। কৃষকদেরকে উৎপাদনে সহায়তা করা ও নতুন প্রযুক্তি, বীজ, সার, কীটনাশক, জ্বালানি ইত্যাদি যথাসময়ে ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা সংগঠনটির প্রধান দায়িত্ব। সারা পৃথিবীব্যাপী সদস্যদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাত করাও সংগঠনটির কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকার আর একটি উল্লেখযোগ্য সমবায় সংগঠন হচ্ছে দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষক সমবায়। এর বার্ষিক আয় হচ্ছে ১৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, উন্নত প্রযুক্তি সহায়তা, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের কাজে সংগঠনটি সদা

নিয়োজিত। তাছাড়া সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে বিমা ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা সংগঠনটির কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের মিনিসোটায় প্রতিষ্ঠিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সংগঠন হচ্ছে ল্যান্ড ও লেকস। এর বার্ষিক আয় ১৩.৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ৮ জুলাই। সংগঠনটির নিয়মিত সদস্য সংখ্যা ১,৯৫৯ জন। এছাড়া রয়েছে ৭৫০ জন অনিয়মিত সদস্য। প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত মোট কর্মচারীর সংখ্যা ১০ হাজার। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে পনির, মাখন, দুধ, চকলেট, ডিম এবং পশুখাদ্য উল্লেখযোগ্য।

জার্মানির বে ওয়া পৃথিবীর আর একটি বৃহৎ কৃষি সমবায় সংগঠন। এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯২৩ সালের ১৭ জানুয়ারি। এর সদর দপ্তর মিউনিখে অবস্থিত। সংগঠনটির বার্ষিক আয় ১৮.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি কৃষিপণ্যের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। দেশে ও বিদেশে সবজি, ফল ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিপণন করা এই প্রতিষ্ঠানটির মূল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

ইউরোপের ফ্রিজল্যান্ড কম্পিনা আর একটি বিশ্ববিখ্যাত কৃষি সমবায় সংগঠন। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে। মোট সদস্য সংখ্যা ১৭,৪১৩ জন। তাছাড়া রয়েছে ১১ হাজার ৪৭৬ জন দুগ্ধ খামারি, যাদের অবস্থান জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়াম জুড়ে ছড়ানো। এ সংগঠনটি সদস্যদের দুগ্ধজাত পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপণন করে থাকে। এর বার্ষিক আয় ১৩.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কৃষি সমবায় তথা দুগ্ধ সমবায়ের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য দেশ হচ্ছে নিউজিল্যান্ড। সেদেশের ফন্টেরা সমবায় সংঘ লিমিটেড বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহৎ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় হিসেবে বিবেচিত। এর বার্ষিক আয় ১৩.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সদস্য সংখ্যা ১০ হাজার ৫০০ দুগ্ধ খামারি। মোট বার্ষিক দুগ্ধ উৎপাদন ২ বিলিয়ন লিটার। এ সংগঠনটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুধ, পনির, মাখন, দই এবং আইসক্রিম সরবরাহ করে থাকে।

ডেনমার্কে অবস্থিত আরলা ফুডস একটি বহুল পরিচিত খাদ্য সমবায়। এটি মূলত দুগ্ধজাত খাদ্যপণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮০ সাল। ডেনমার্ক ও সুইডেনে ছড়িয়ে থাকা মোট ১১ হাজার ২০০ সদস্য নিয়ে এর অভিযাত্রা। মোট দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ১৩.৭ বিলিয়ন কিলোগ্রাম। বার্ষিক আয় ১৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বের ১৫১টি দেশে সংগঠনটি দুধ, পনির, মাখন, ক্রিম ও মার্জারিন রপ্তানি করে থাকে। এ সকল পণ্য উৎপাদনের জন্য সংগঠনটিতে ৬০টি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা নিয়োজিত রয়েছে। ডেনমার্কের শতকরা ৯৫ ভাগ দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

ইজরায়েলে প্রতিষ্ঠিত কৃষি সমবায়ভিত্তিক সংগঠন কিবুজ পৃথিবীর গবেষক ও উন্নয়ন চিন্তকদের দৃষ্টি কেড়েছে। এটি গ্রামীণ সমবায় ও যৌথ খামারের প্রতিভু। এটি সরকারি মালিকানাধীনে পরিচালিত দেশের সকল নাগরিকের কল্যাণার্থে গড়ে ওঠা যৌথ কৃষি সমবায়। এর সদস্যগণ সরকার থেকে ৪৯ থেকে ৯৯ বছরের জন্য জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করে থাকে। সদস্যপদ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করতে হয়। ইচ্ছে হলে কেউ তা ছেড়েও চলে যেতে পারে। এর প্রকৃতি সমাজতান্ত্রিক। সদস্যগণ যোগ্যতা অনুসারে কাজ করে এবং প্রয়োজন অনুসারে সেবা গ্রহণ করে। এর ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক। এখানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত। সদস্যদের জীবনমানও সমান। এর প্রতিষ্ঠা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ১৯০৯ সালে। এখন তা শতবর্ষ পেরিয়ে আরও এক যুগ অতিক্রম করেছে। ২০১০ সালের তথ্য অনুসারে ইজরায়েলে কিবুজের সংখ্যা ২৭০টি। দেশের শিল্প উৎপাদনের ৯ শতাংশ এবং কৃষি উৎপাদনের ৪০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে কিবুজ। মরুভূমিকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ ও খামার যন্ত্রায়নের মাধ্যমে সবুজ শস্যের ভান্ডারে পরিণত করার ক্ষেত্রে বড় অবদান রেখেছে গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কিবুজ।

ভারতে বহুল পরিচিত দুগ্ধ সমবায় সংগঠন আমুল ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গুজরাট সমবায় দুগ্ধ বিপণন ফেডারেশন লিমিটেড এই সংগঠনটির পরিচালনা কাজে নিয়োজিত। এতে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সদস্য সংখ্যা ৩.৬ মিলিয়ন। এর সাথে যুক্ত রয়েছে ১৩টি জেলার দুগ্ধ সমবায় ইউনিয়ন, যা ১৩,০০০ গ্রামে বিস্তৃত রয়েছে। ভারতের জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড-এর তত্ত্বাবধানে আমুল শ্বেত বিপ্লব ত্বরান্বিত করে দেশটিকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ দুগ্ধ উৎপাদনকারী দেশে পরিণত করেছে। এ সংগঠনটি প্রতিদিন গড়ে ৪ থেকে ৫ লক্ষ প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাত করছে। এর বার্ষিক আয় ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে এর আওতাধীন প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যা ২,৫১৭টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৭,৭৫৮ জন। এই সমিতির উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ড নাম মিল্ক ভিটা। তরল দুধের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি ঘি, মাখন, মিষ্টি ও টক দই, আইসক্রিম, ক্রিম, চকলেট, লাবাং, রসগোল্লা, সন্দেশ, রসমালাই ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে। এর বার্ষিক দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ ৪.৩২ কোটি লিটার। শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৪৪ কোটি ১৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। বার্ষিক নিট লাভের পরিমাণ ১৮৫.৬৯ লক্ষ টাকা। ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে একটি পথিকৃৎ সমবায় সংগঠন হিসেবে কাজ করছে মিল্ক ভিটা।

বাংলাদেশ সমবায়ের এক উর্বর ভূমি। বর্তমানে এদেশে ২৯ প্রকারের সমবায় সমিতি রয়েছে। মোট সমিতির সংখ্যা ১,৯০,৫৩৪টি। তাতে অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন। এদের একটি বড় অংশ কৃষি সমবায়ের সঙ্গে জড়িত। তারা কৃষিপণ্যের উৎপাদন করছে, মধ্যস্বত্বভোগীদের নাগপাশ এড়িয়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করছে। সমবায়ের মাধ্যমে তারা উন্নত বীজ, সার, সেচ ও কৃষি যন্ত্রায়নের ব্যবস্থা করছে। এক্ষেত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই দেশের কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে অধিক উৎপাদন ও লাভজনক বিপণনে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘‘সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার, ধনী-চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে। সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা।’’

বর্তমানে বাংলাদেশে যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে তাতে সমবায়ী কৃষকদের বড় অবদান রয়েছে। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদেরকে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। তার জন্য দেশের খাদ্য ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন বছরে গড়ে সাড়ে ৪ থেকে পাঁচ শতাংশ হারে বাড়িয়ে যেতে হবে। দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষুদ্র চাষিদের পক্ষে এত দ্রুত উৎপাদন বাড়িয়ে যাওয়া খুবই দুষ্কর। এর জন্য দরকার তাদেরকে সংগঠিত করা। আর্থিক ও সামাজিকভাবে তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা। সমবায়ের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। এ লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করা দরকার। রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা বাড়ানো দরকার দেশের সমবায়ী কৃষকদের জন্য। তাতে কৃষি সমবায়ের ভিত্তি আরও দৃঢ় হবে। সমৃদ্ধিশালী হবে দেশের অর্থনীতি।

ড. জাহাঙ্গীর আলম: কৃষি অর্থনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা। উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ। সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট। গবেষণা ক্ষেত্রে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদকপ্রাপ্ত।

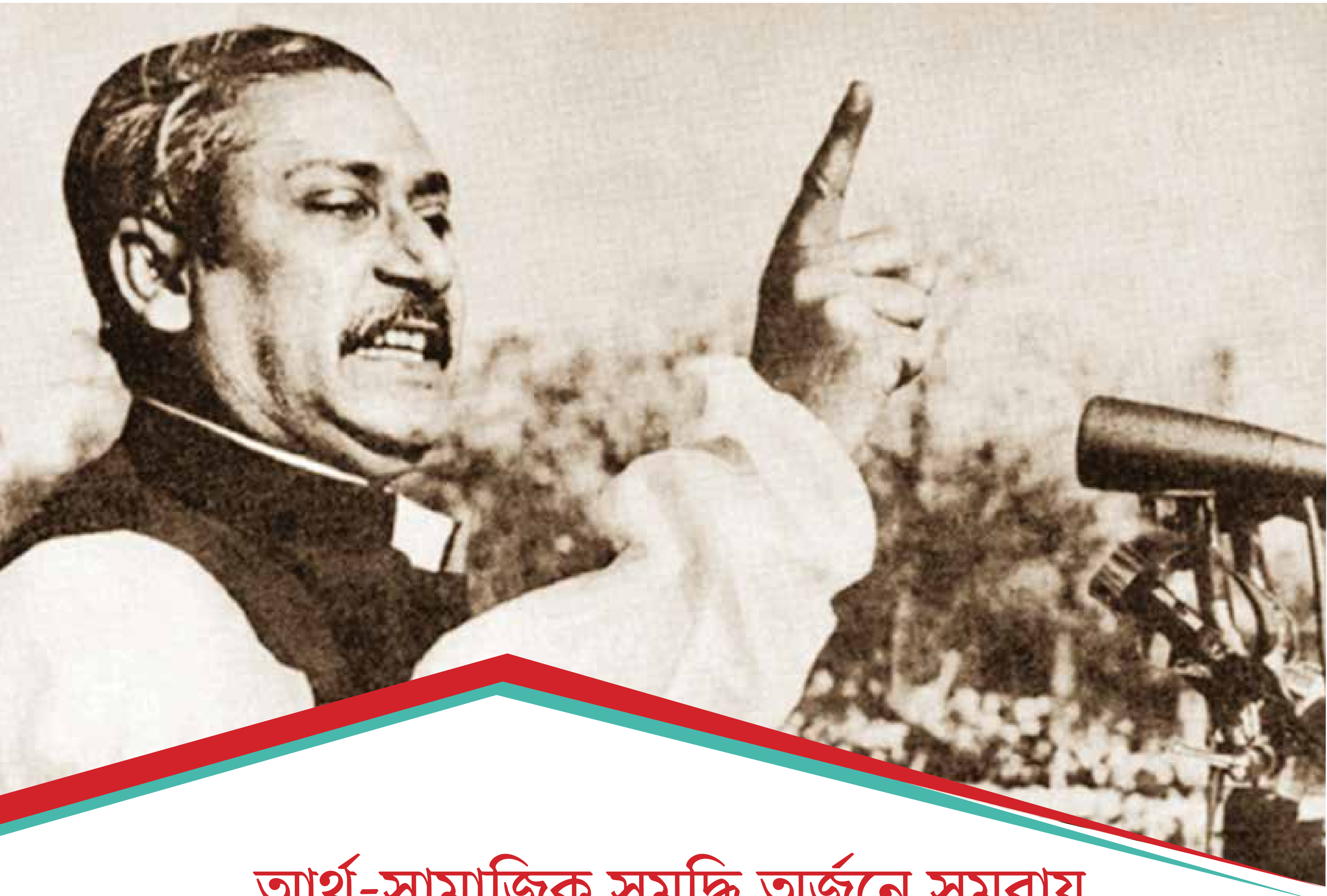

আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সমবায়

ড. মিল্টন বিশ্বাস

''আমাদের আদর্শ হলো বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ইজ্জত সহকারে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখা, বাংলার দুঃখী মানুষকে পেট ভরে খাবার দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা, যেখানে অত্যাচার অবিচার জুলুম থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না।'' —বঙ্গবন্ধু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলার আদর্শিক ভিত্তি ছিল একটি বৈষম্যমুক্ত, শোষণহীন সমাজ; সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়নমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন; এ কাজে বঙ্গবন্ধু ''সমবায়''কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই তিনি সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে সমবায়কে স্থান দেন। বঙ্গবন্ধু কৃষি সমবায় সমিতি এবং মৎস্যজীবী সমবায় গঠন করেন। এছাড়া তাঁতি সমবায় সমিতি, শিল্প সমবায় সমিতি, মিল্ক ভিটা গড়ে তোলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। ১৯৭২ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে— এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ— সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির

শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।' উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পরে জাতির পিতার নির্দেশ অনুযায়ী সারাদেশে সমবায়ভিত্তিক নানান কার্যক্রম চালু হয়। গ্রামভিত্তিক কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের উচ্চফলনশীল বীজ, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি এবং গভীর নলকূপ সরবরাহের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। পাশাপাশি তাঁর উৎসাহে জেলে, তাঁতি প্রভৃতি পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমবায়ের নতুন যাত্রাপথ তৈরি হয়।

বঙ্গবন্ধুর আমলেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করা হয়। জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দেন তিনি। সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয় মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা। এর ফলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল—ভোগের ন্যায্য অধিকার। অর্থাত্ তাঁর আমলে সমবায় আন্দোলন ছিল সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। সেসময় সমবায় সংস্থাগুলোকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত হয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর। সমবায়ের পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে এমন একটি নুতন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যাশা ছিল। উপরন্তু শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাত্ করে দেবার প্রত্যয়ে ছিল দৃঢ়তা। সমবায় সংস্থার অবাধ বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দুর্নীতির জগদ্দল পাথরকে সরাতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য ছিলেন বদ্ধপরিকর। লেখাবাহুল্য, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে বাধ্যতামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে 'সমাজের পরিবর্তন চাই' অংশে বঙ্গবন্ধু গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ''পাঁচবছরের পস্ন্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ। এর জমি মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে।'' উপরন্তু ১৯৭৫ সালের ১৯ জুন বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দলীয় চেয়ারম্যান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দেন তাতেও সমবায় সম্পর্কে বলেন— ''বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। আমরা নতুন ল্যান্ড সিস্টেম-এ আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভে আসতে চাচ্ছি। দিজ ইউনিয়ন কাউন্সিল ওল্ড ব্রিটিশ ইউনিয়ন কাউন্সিল। যেখানে যা দেওয়া হয়, অর্ধেক থাকে না, সাথে সাথে সাফ। সেজন্য একমাত্র উপায় আছে যে আমরা যে আজকে মাল্টিপারপার কো-অপারেটিভ চালু করতে চাচ্ছি, এটা যদি গ্রো করতে পারি আসেত্ম আসেত্ম এবং তাকে যদি আমরা ডিস্ট্রিক্ট এবং থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।'' বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই হাঁটছে বর্তমান বাংলাদেশ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অনেক। দরিদ্র নর-নারী কিংবা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির একটি অন্যতম পথ হচ্ছে সমবায়। সাধারণ মানুষ এখন জানেন, সমবায় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেটি একদল সদস্য তাদের সম্মিলিত কল্যাণের জন্য পরিচালনা করেন। সমবায়ে সমমনা মানুষের সমাগম হয়। এটি স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন যা নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে এবং এ লক্ষে অংশীদারিত্ব ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা পরিচালিত হয়। আবার একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান এমনও হতে পারে যেখানে ব্যবসাটি এর সুবিধাভোগী সকলে সমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে অথবা তারাই ওই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। 'সমবায় অধিদপ্তরে'র ওয়েবসাইটের সূত্রে দেখা যায় এদেশের প্রায় ২ কোটি মানুষ সমবায় সমিতির সঙ্গে জড়িত। যারা প্রায় ২ লাখ সমবায়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় কিংবা আঞ্চলিক পরিসরে কাজ করছেন কিংবা অবদান রাখছেন দেশের উন্নয়নে। সমবায়ের সুবিধাগুলো হলো— সমবায়ের মাধ্যমে সহজে নিজেদের উন্নতিসহ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করা যায়, আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করা যায়, শ্রমজীবী মানুষ একজনের পক্ষে যে কাজ সম্ভব নয় সমবায়ের মাধ্যমে দশ জনের পক্ষে সে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, সমবায়ের সদস্যদের এবং বেকার লোকদের কর্মসংস্থান হয়, সমবায়ের মাধ্যমে সমবায়ের সদস্যরা সঞ্চয়ে উৎসাহী হয়, সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু যে সমতাভিত্তিক গ্রামীণ সমবায়ের কথা বলেছিলেন, তার উল্লেখ না থাকলেও— বর্তমান শতাব্দীতে এসডিজির(SDG) অভীষ্ট অর্জনে সমবায়ীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রত্যয় রয়েছে। আসলে সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তোলার সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে। দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানের টেকসই হাতিয়ার হচ্ছে সমবায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়ন করে চলেছে। সরকার দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় কার্যক্রম চালু করেছে। বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায় আন্দোলন কয়েকটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হচ্ছে। মূলনীতি হলো— একতা, সাম্য, সহযোগিতা, সততা, আস্থা, বিশ্বাস, গণতন্ত্র ও সেবা। বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য এদেশের মানুষের মূল্যবোধের সাথে মিল রেখে কিছু সেস্নাগান সামনে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। যেমন, 'একতাই বল' এবং মূল কথা হলো 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। এদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষকরা সমবায় নীতি মেনে একতার সাথে কাজ করলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে; ফলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে। আবার সমবায় নীতি অনুসরণ করলে মানুষের একসাথে ভাগ্য পরিবর্তন হবে সমাজের মাঝ থেকে দারিদ্র্য দূর হবে। এজন্য এদেশের সমবায় নীতির গুরুত্ব বিশদ।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমবায় বিভাগের কাজ হলো সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন। এজন্য সমবায় বিভাগ গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা কমিয়ে আনা, অসমতা কমানো এবং কৃষির উৎপাদনশীলতা ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপার্জন বাড়ানোর চেষ্টা রয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন, গ্রামীণ সংগঠন প্রতিষ্ঠা উৎসাহিতকরণ, গ্রামীণ পুঁজি সুবিধা, নাগরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে উদ্দীপনা জোগানোর পাশাপাশি কিছু সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম। এই অভীষ্ট অনুসারে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় বিভাগের মাধ্যমে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের উদ্যোগ নেয়া হবে:

(১) কর্মসংস্থান বাড়ানো ও আয় সৃজনের লক্ষ্যে গ্রামীণ প্রবৃদ্ধি ও অর্থনীতির বহুমুখীকরণ ত্বরান্বিতকরণ; (২) ঝুঁকিগ্রস্থ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দারিদ্র্য হার কমিয়ে আনা; (৩) দরিদ্র অঞ্চলের প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার মাধ্যমে জেলাগুলোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা; (৪) আর্থিক সম্পদ সৃষ্টি ও উৎপাদন কার্যক্রমে সমবায়ের কর্মকাণ্ড উৎসাহিতকরণ; এবং (৫) কৃষিপণ্যের বিপণনের জন্য কৃষক, অকৃষিখাতে নিয়োজিত কর্মী এবং বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উল্লেখ্য, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসন ও দুর্দশা কমাতে ধারাবাহিকভাবে অবদান রেখে চলেছে। এক্ষেত্রে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আয়বর্ধক কর্মসূচি, কর্মসৃজন, প্রশিক্ষণ, পুঁজি সরবরাহ, পুঁজি গঠন, খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি। মনে রাখা দরকার, নারীদের সহায়তার জন্য চারটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কমর্সূচি বাস্তবায়ন করছে সরকার। এসব কর্মসূচির সুবিধাভোগী ২১ লাখের বেশি নারী। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অংশ হিসেবে ভিজিডি কার্যক্রম, মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচি, ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি, নারীদের আত্মকর্মসংস্থানে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এসব কার্যক্রমের ফলে একদিকে কর্মজীবী নারীরা যেমন স্বাবলম্বী হচ্ছেন, অন্যদিকে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে উদ্যোক্তা হয়ে উঠছেন অনেকে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সমবায় বিভাগ তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতা ও কর্মসূচির সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ : সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ গ্রামীণ জনপদে উন্নয়ন, শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য 'জাতীয় পলিসি উন্নয়ন নীতি, ২০০১'-এ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ক্রীড়ার মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দেশিয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের বিকাশ সাধনে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে উদ্যোগ নেয়া হবে। সমবায় বিভাগ তাদের অধীন বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গ্রাম উন্নয়ন সংঘগুলোর মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং গ্রামীণ জনপদের সাংস্কৃতিক সম্পদের বিকাশে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে সমাজ উন্নয়ন সংঘের যৌথ সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও ভূমি জোনিং : বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ এবং এর অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। কৃষির জন্য ভূমি ও মাটি হচ্ছে প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। ভূমির সঙ্গে মানুষের আনুপাতিক হারের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ। ফলে ভূমির অযথার্থ ও অপরিকল্পিত ব্যবহার রোধ করে মাটির গুণাগুণ রক্ষার পাশাপাশি এর যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতে চাহিদা অনুসারে ভূমির যথাযথ জোনিং করা গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বিআরডিবি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। আবাসিক, বাণিজ্যিক ও কৃষিতে ভূমির ব্যবহার নির্দিষ্ট নিয়মে নির্ধারণ করা হবে। টেকসই উন্নয়নের জন্য ভূমির এরূপ যথাযথ ও দক্ষ ব্যবহারের বিষয়ে প্রাধিকার দেওয়া হবে।

'বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১'(মার্চ ২০২০) নামক গুরুত্বপূর্ণ দলিলের সঙ্গেও সমবায়ের নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, 'রূপকল্প ২০৪১' কে নীতিমালা ও কর্মসূচিসহ একটি উন্নয়ন কৌশলে রূপান্তরের জন্য এ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ দলিল মূলত ২০৪১ সালের মধ্যে এক সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ অর্জনে সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের একটি কৌশলগত বিবৃতি এবং তা বাস্তবায়নের পথ-নকশা। চারটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, যেমন- সুশাসন, গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত এ পরিকল্পনার সুফলভোগী হবে জনগণ এবং এরাই হবে প্রবৃদ্ধি ও রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রধান চালিকাশক্তি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন— বাংলাদেশ একদিন ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে ২০ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটি একটি ভিশন দলিল, এটি একটি দিকনির্দেশনামূলক দলিল এবং এর ওপর ভিত্তি করে চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে/হবে। সেখানে বিস্তারিতভাবে কৌশলসমূহের উল্লেখ থাকবে। দুটি কারণে দলিলটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রথমত : যদি বাংলাদেশ ২০২১ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের শর্ত পূরণ করে তবে ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিক উত্তরণ সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত : ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায়, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) তৈরিতে সহায়তা করার জন্য আমাদের স্বপ্ন পূরণের এই দলিল (২০২১-২০৪১) নির্ধারিত সময়ের এক বছর পূর্বে প্রণয়ন করতে হয়েছে। কারণ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িতব্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে এটাই হবে প্রথম। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা মেয়াদে অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। এই ভিশন দলিলটির ১২ টি অধ্যায় রয়েছে-যার মধ্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো : সুশাসন, মানব উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি, বিদ্যুত্ ও জ্বালানী, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ। এর মধ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো আছে যাতে প্রতি অর্থবছরে অর্থনীতির সূচকগুলোর লক্ষ্যমাত্রা বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে।

লেখাবাহুল্য, বাংলাদেশে রূপরেখা অনুসারে স্বপ্ন বাস্তবায়নের এই প্রত্যাশার সূচনা হয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। বিএনপি-জামায়তের অপরাজনীতি থেকে দেশকে উদ্ধার করে ২০০৯ সালে তিনি দিনবদলের সনদ গ্রহণ করেন। প্রতিশ্রুতি ছিল ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে আনা, দারিদ্র্য মোকাবেলা, জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে আসীন করা। আওয়ামী লীগের 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের জন্য প্রথমবারের মতো 'বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' প্রণয়ন করে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়। ষষ্ঠ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয় সকল মানদণ্ড পূরণ করতে পেরেছে, ২০১৫ সালের এমডিজি'র অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জনসহ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের শ্রেণিভুক্ত হয়েছে এবং দশকব্যাপী ৭ শতাংশ হারে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনও সম্ভব হয়েছে। 'রূপকল্প ২০২১' এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-এর স্বপ্নের উন্নয়নের পথে জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যেই 'রূপকল্প ২০৪১' গ্রহণ করা হয়।

শেখ হাসিনা চেয়েছেন, ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ-মধ্য আয়ের সোপানে উত্তরণ, এদেশ থেকে ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবলুপ্তিসহ উচ্চ-আয়ের উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন করতে। বিশ্বের বিভিন্ন উচ্চ-মধ্যম ও উচ্চ আয়ের দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে, গ্রাম প্রকৃতই হবে এদেশের শহর। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ প্রণয়নের দশ বছর শেষ হবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর রূপান্তর ঘটানোর যে প্রত্যয়

ছিল তা ২০২১ সালের করোনা মহামারির মধ্যেও টার্গেট পূরণে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে এদেশ আজ তার সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথের সন্ধান পেয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীকে সম্পদে পরিণত করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞানের বিকল্প নেই। গত এক যুগে শেখ হাসিনা সরকার সরকারি সেবা প্রদানের প্রতিটি স্তরে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি খাতে সেবা প্রদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনমানের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আসলে আগামী দুই দশকে বাংলাদেশে উন্নয়নের ফলে যে রূপান্তর হবে তা 'বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বাংলাদেশকে রূপান্তরের জন্য ১৪ টি অভীষ্ট ছিল। দশ বছর পর সেগুলোর অধিকাংশ অর্জিত হয়েছে বা ২০২১ সালের করোনা মহামারির মধ্যেও লক্ষ্য অর্জনের পথে রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, আমরা নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সকল শর্ত পূরণ করেছি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৪ সালে তা কার্যকর হবে। আমরা এমডিজি অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছি। এই মুহূর্তে এসডিজি'র সময়ে আমাদের দরকার ত্বরিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশীদারিত্বমূলক সমৃদ্ধির জন্য টেকসই রূপান্তর।

মূলত রূপকল্প ২০২১- এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের আলোকে স্বপ্নের উন্নয়ন পথে জাতিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যেই ''রূপকল্প ২০৪১'' গ্রহণ করা হয়েছে। এই রূপকল্পের প্রধান অভীষ্ট হলো ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের দ্রুত অবলুপ্তিসহ উচ্চ-আয় দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়া। রূপকল্প ২০৪১-কে একটি উন্নয়ন কৌশলে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচিসহ এই দলিলটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ : বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১'। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর সাফল্যের ওপর গড়ে ওঠেছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১। এছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন উচ্চ-মধ্যম ও উচ্চ-আয়ের দেশ যে-উন্নয়ন পথ পাড়ি দিয়েছে, তাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে সে পথে এগিয়ে যেতে চায় বাংলাদেশ। প্রকৃতপড়ো উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা তথা সমাজের কাঠামোর আমূল রূপান্তরই সমবায়-ভাবনার লক্ষ্য।

SDG এর লড়্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির গুরুত্ব অনেক। আর এজন্য জনগণকে সহায়তা দিয়ে চলেছে 'সমবায় অধিদপ্তর'। ২০১৬ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য SDG- তে যে সকল বিষয়ে লক্ষ্য ও টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে— দারিদ্র্য থাকবে না, অনাহারি শূন্যের কোঠায়, সুস্বাস্থ্য ও সুখকর অবস্থা, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, পরিচ্ছন্ন পানি এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সাশ্রয়ী মূল্যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী, পরিচ্ছন্ন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো, বৈষম্য কমিয়ে আনা, টেকসই শহর ও সমাজব্যবস্থা, দায়িত্বশীল উৎপাদন এবং ভোগ, জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রম, পানির নিচের জীবন সম্পর্কিত কার্যক্রম, ভূমির উপর জীবন সম্পর্কিত কার্যক্রম, শান্তি, বিচার ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠানসমূহ, লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অংশীদারিত্ব। বাংলাদেশ ২০১৮ সালের ১৬ মার্চ 'স্বল্পোন্নত' দেশ থেকে 'উন্নয়নশীল' দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। এর আগে দীর্ঘ ৪২ বছর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় ছিল এদেশ। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মতামত হলো, অতীতে শেখ হাসিনা সরকার গ্রামীণ জনপদে পরিবর্তনের অঙ্গীকারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাছাড়া এই সরকারের রয়েছে ধারাবাহিকতা। ফলে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো গতি পেয়েছে। গ্রামের অর্থনীতির প্রায় সমগ্রটা জুড়ে আছে কৃষি আর গ্রামীণ উৎপাদন কাঠামো, গত ১২ বছরে সেই গ্রামের উন্নয়নের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস নিলে দেখা যাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের ধারায় বর্তমান সময়ে ভিন্নতর এক মাত্রা সংযুক্ত হয়েছে। এসময়(২০০৯-২০২০) সরকারি বাজেটে গ্রামাঞ্চলের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গ্রামের অতীত ঐতিহ্য ও সামপ্রতিক কালের কৃষি রূপান্তরের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নয়ন ভাবনায়ও এসেছে নতুন অভিব্যক্তি। যে অভিব্যক্তিতে 'সমবায়' অনুভাবনার রয়েছে অনিবার্য প্রভাব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী সমবায় সমিতিগুলোকে আরো জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমবায়কে আরো কার্যকর করে তোলার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে পুরস্কার প্রদান করে জনগণকে উৎসাহিত করে আসছে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে একটি উন্নত দেশ হিসেবে দেখতে হলে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের পথে এগোতে হবে। সমবায়ের অর্থনীতির ওপর সমবায়ী মানসিকতাকেও প্রাধান্য দেয়া দরকার। সেজন্য সরকারকেই প্রথম উদ্যোগ নিয়ে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যেতে হবে। এজন্য শেখ হাসিনা সরকার সমবায় অধিদপ্তরে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যেমন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে দুগ্ধসমৃদ্ধ উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের সম্প্রসারণ; আমার গ্রাম আমার শহর ধারণার বাস্তবায়ন-বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ প্রতিষ্ঠা; হাওর অঞ্চলের মানুষের জন্য বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা; সমবায়ের মাধ্যমে সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের জীবন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; গ্রামীণ যুব ও নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এছাড়াও টেকসই কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় রয়েছে— সমবায়ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থার উন্নয়ন; ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সমবায়ভিত্তিক কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলন ঘটানো; ৬১টি জেলায় দুগ্ধ সমবায়ের বিস্তার ঘটানো; কৃষিপণ্যের সমবায়ভিত্তিক বাজার প্রতিষ্ঠাকরণ; দুগ্ধ সমবায়ের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারী, শিশু ও কিশোরী মেয়েদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে দুগ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীদের অন্তর্ভুক্তকরণ। গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন : আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সমবায়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

অন্যদিকে সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশ তার অর্জন নিয়ে গৌরবান্বিত। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে দারিদ্র্যের হার ছিল মাথাপিছু ৮০ শতাংশ। পরবর্তীকালে ২০১৯-এ সাধারণ দারিদ্র্য হার ২০.৫% এবং চরম দারিদ্র্য হার ১০.৫% এ নেমে আসে। দারিদ্র্য নিরসনে এই দ্রুত অগ্রগতি নীতিপ্রণেতাদের সাহসী করে তোলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণে। রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্য হলো ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ-আয়ের দেশে উন্নীত করা, যেখানে দারিদ্র্য হবে নিম্নতম। আসলে এসডিজি'র মূলনীতি স্পষ্টভাবে এটিই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রান্তিক জনগণের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করে তাদের জীবনকে এগিয়ে না নিতে পারলে টেকসই উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধ জাতি অর্জনের স্বপ্ন বাস্তবে অধরা থেকে যাবে। আর এ সমস্ত কর্মযজ্ঞের সঙ্গে ''সমবায়'' ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ড. মিল্টন বিশ্বাস : ইউজিসি পোস্ট ডক ফেলো, বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

টেকসই উন্নয়নের নতুন ধাপ সমবায়ভিত্তিক পর্যটন

ড. সন্তোষ কুমার দেব

'স্বাবলম্বন ও সম্মিলিত উন্নয়ন সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন', এই মূলমন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে গোড়াপত্তন হতে পারে সমবায় পর্যটন সমিতির। সমবায় পর্যটন সমিতি ধারণা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শিল্প বিপ্লবোত্তর কালে অর্থনীতির মানদণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে- একটি ধনবান পুঁজিপতি শ্রেণি, অন্যটি শ্রমিক ও সাধারণ বিত্তহীন শ্রেণি। সে সময়ে শিল্পপতিরা তাদের খেয়াল খুশিমতো শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্যের দাম, শ্রমিকদের মজুরি ইত্যাদি নির্ধারণ করতো। শ্রমিক ও সাধারণ দরিদ্র শ্রেণিকে তখন পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের কৃপার ওপরেই নির্ভর করে চলতে হতো। এসব প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিক কর্মী ও দরিদ্র জনগণ সমবায় আন্দোলন নামে এক বিশেষ

মতবাদে ঐক্যবদ্ধ হয়। মূলত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রায় সকল কাজই সমবায় প্রাধান্য পায়। কারণ সেক্ষেত্রে শ্রেণি বৈষম্য তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না এবং সকলের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। উৎপাদক, ক্রেতা, ভোক্তা, শ্রমিক, মোটকথা সমাজের সকল শ্রেণির লোকই সমবায় সমিতির মত সমবায় পর্যটন গড়ে তুলে সম্মিলিত কার্যক্রমের সুবিধা ভোগ করতে পারে। 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'- এ চিন্তাধারা হতেই সমবায়ের জন্ম। সমশ্রেণি বা সমপেশাভুক্ত কতিপয় ব্যক্তি একে অন্যের সাহায্যে নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমবায় পর্যটন এক নতুন ধাপ। বর্তমানে যেকোনো অর্থনীতিতে বিশেষ করে বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য এরূপ গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচেষ্টার সমবায় পর্যটনের গুরুত্ব অসীম। সমবায় দেশের অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করে।

'Unity is strength' এ স্লোগানই সমবায়ের মূলমন্ত্র। যেখানে একক ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় বৃহৎ কার্য সম্পাদন করা যায় না সেখানে সমবায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার শিক্ষা দেয়। দুর্বল ও শোষিত শ্রেণি সমবায়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহৎ কোনো অর্জনের পথকে প্রশস্ত করতে সক্ষম হয়। নিম্ন আয়ের লোকজন কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, মৎস্য চাষ ও খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের আর্থিক কল্যাণ সাধন হয়। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হয়। সমবায় সমাজের নিম্নবিত্ত শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মের সংস্থান করে। কারণ সমবায় তাদের কর্মের যোগান দেয় এবং এর মাধ্যমে সমবায়ীরা আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পায়। সমবায় পর্যটন সমিতি সাধারণত নিম্নবিত্ত ও সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণধর্মী সংগঠন। সমাজের অনুন্নত শ্রেণির অধিকসংখ্যক ব্যক্তি সমবায়ের মাধ্যমে তাদের পুঁজি একত্রিত করে যে মুনাফা অর্জন করে তা নিজেদের মধ্যে বণ্টিত হয়। ফলে এটি তাদের দারিদ্র্য দূর করে আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের একটি বাহন হিসেবে কাজ করে।

অধিকসংখ্যক সমবায় পর্যটন আকর্ষণ তৈরি হলে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে, সমাজের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচির পরিবর্তন হবে। এমনি আর্থ-সামাজিক এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে। দেশের কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, দরিদ্র কৃষক শ্রেণি এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মালিকগণ সমবায়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়। এতে তারা সরকারি সহযোগিতায় উন্নয়ন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে। ফলে কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সহজতর হয়। সমবায় কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকেই দৃষ্টিপাত করে তা নয়, এটি সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যসূচি গ্রহণ করে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, আবাসিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি নানাবিধ কল্যাণকর কাজের অংশ হিসেবে সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং পর্যটনের একটি উপস্থাপনায় "শ্রমজীবী মানুষের জন্য পর্যটন ধারণাটির বিকাশের রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল, যার উৎপত্তি ফ্রান্সে। এছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন গ্রিস, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড। কিছু দেশে বিদ্যমান ভোক্তা সমবায় ভ্রমণ সংস্থার নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে এমনকি সমবায় থেকে উৎপত্তি জাপান ও কোরিয়ায় তাদের সদস্যদের জন্য সেবা প্রদানের জন্য পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে। মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভিয়েতনাম, চীন এবং ভারতে সমবায় পর্যটন রয়েছে। এই ধরনের সমবায় জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে সমবায় পর্যটনকে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন যার ফলশ্রুতিতে একদিকে স্থানীয় লোকদের জন্য কর্মসংস্থান ও কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং অন্যদিকে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। কিছু পর্যটন সমবায়ের সাফল্যের কাহিনি ইঙ্গিত দেয় যে ইউরোপীয় দৃশ্যপট বাংলাদেশে ছোট আকারে

প্রতিলিপি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সফল মৎস্য সমবায় যা মাছ উৎপাদনের জন্য বর্জ্য জল ব্যবহার করেছে। সোসাইটি এখন একটি প্রকৃতি পার্ক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে, যা শহরের পর্যটক হট স্পট হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। পার্কটিতে আকর্ষণীয় নৌকাবাইচ সুবিধা রয়েছে এবং একটি বাস্তুতন্ত্র তৈরি করা হয়েছে যা অসংখ্য পাখিকে আকর্ষণ করে। বিভিন্ন এলাকায় একদল মানুষ পর্যটন খাতে কাজ করার জন্য সমবায়ের ন্যায় সমবায় পর্যটন গঠন করেছে। সমবায় পর্যটন প্রাথমিকভাবে কিছু সদস্য নিয়ে গঠিত হয় যা এটি গ্রামবাসীদের সংগঠিত করে একটি নতুন ব্যবসায়িক মডেল স্থাপন করা সম্ভব।

কোভিড-১৯ পরবর্তী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনীতির অবস্থা চাঙা করতে ক্ষুদ্র ঋণের চেয়েও অধিক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সমবায় পর্যটন। সমবায় পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থিক সচ্ছলতার পাশাপাশি স্থায়ী উপার্জনের পথ সুগম হবে। পর্যটকরা এখন গ্রামমুখী। গ্রামের নান্দনিক সৌন্দর্য দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে উল্লেখ্য গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা, চাষাবাদ, লোক-সংগীত, গ্রামীণ জীবনধারা, সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলার গ্রামবাংলার, জীববৈচিত্র্য ও সবুজের সমারোহ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনের জন্য বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন, সমবায় পর্যটন উন্নয়ন ধারণার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সমবায় পর্যটন উন্নয়ন করা তাৎপর্যপূর্ণ।

২০২০ সালের বিশ্ব পর্যটন দিবস এর প্রতিপাদ্য ছিল 'গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন'। সময়ের পরিক্রমায় গ্রামীণ উন্নয়নের উপর একটি দেশের জাতীয় উন্নয়ন নির্ভরশীল। গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, গ্রামীণ মানুষের সহজসরল জীবনধারা, নদী, হাওর, বিল-ঝিল, লোকজ অনুষ্ঠান, প্রাচীন বৃক্ষ ও গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলা ও অন্যান্য। গ্রামগুলো হতে পর্যটন আকর্ষণের অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। বাংলাদেশের পর্যটন কর্পোরেশন ১৯৯০ সালে 'একটি গ্রাম একটি পর্যটন আকর্ষণ' টেকসই পল্লী উন্নয়ন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়ন হতে পারে সমবায়ভিত্তিক পর্যটনের মাধ্যমে। বাংলাদেশের ৮৬ হাজার গ্রামবাংলা ৮৬ হাজার পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র, কারণ একটি গ্রাম থেকে আরেকটি গ্রাম আলাদা। কোনো কোনো গ্রাম নদীকেন্দ্রিক, পাহাড়কেন্দ্রিক, হাওড়কেন্দ্রিক, বিলকেন্দ্রিক। এই-গ্রাম ব্র্যান্ডিং করে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আমরা গ্রামে আকর্ষণ করতে পারি। একটি গ্রাম থেকে আরেকটি গ্রামের মানুষের আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, প্রথা, নীতি, জীবনযাত্রা, বিবাহ-অনুষ্ঠান আলাদা। কৃষকের ধানের চারা রোপণের দৃশ্য আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয়। এ দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা পাওয়া বিরল। মাঠের পর মাঠ সবুজ শস্যক্ষেতগুলো দেখে মনে হয় যেন সবুজ রাজ্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে। গ্রামীণ মানুষের অতিথিপরায়ণতা যেকোনো পর্যটককে বারবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে গ্রামে।যদি গ্রামীণ পর্যটনের দিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রামীণ পর্যটনকে সমবায়ভিত্তিক বিকশিত করতে পারি তাহলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, গ্রামীণ শিক্ষিত বেকারদের কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যাবে। গ্রামীণ পর্যটনের জন্য আমাদের বেশি কিছু করতে হবে না, কারণ বিদেশি পর্যটকেরা গ্রামীণ পরিবেশ বেশি উপভোগ করতে পছন্দ করেন। তাদের জন্য নতুন করে ইটের ঘরবাড়ি বানানোর দরকার নেই। এক্ষেত্রে আমরা হোম-স্টে ব্যবস্থা করতে পারি, যেখানে পর্যটকদের সাদর সম্ভাষণ জানানো ও আতিথেয়তায় মধ্য দিয়ে আকৃষ্ট করা।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙা করা ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের চেয়েও বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সমবায়ভিত্তিক পর্যটন। গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের আর্থিক সচ্ছলতাসহ এদের স্থায়ী উপার্জনের পথ সুগম হয়। এর জন্য ছোট ছোট পর্যটন উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে সরকারিভাবে ঋণও দেয়া যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে বিনোদন সেবা প্রদানে পর্যটন উন্নয়ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিটি গ্রামকে আমাদের বানাতে হবে একেকটি পর্যটন গন্তব্য বা ডেস্টিনেশন। এসব গন্তব্যে শহরের পর্যটকরাও বেড়াতে যাবে, যাতে করে গ্রাম এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ডসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি গ্রামে বিনোদন পার্ক, শিশুপার্ক, লোকজ গান ও ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠ থাকা আবশ্যক। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা করাসহ গ্রামকে শহরে রূপান্তরের জন্য সমবায় পর্যটন উন্নয়ন প্রয়োজন। যা টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় অবদান রাখতে পারে। এখন সমগ্র বিশ্ব দক্ষ মানব সম্পদ সমৃদ্ধ অর্থনীতির ওপর গুরুত্বারোপ করছেন। গ্রামের যুবসমাজকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলে পর্যটন উন্নয়নে তাদের নিজেদের করতে হবে।

সমবায় পর্যটনের মধ্য দিয়ে কমিউনিটি ভিত্তিক ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী তৈরি করা হবে। যা নতুন কর্মসংস্থান তৈরি অনবদ্য অবদান রাখবে। দেশিয় ঐতিহ্যবাহী পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারিত হবে। সমবায়ভিত্তিক পর্যটন এর মাধ্যমে একতা-সাম্য ও সহযোগিতার প্রত্যয় বৃদ্ধি করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যান্য এই শিল্প জাতীয় উন্নয়নে বড় অবদান রাখতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সমবায়ভিত্তিক পর্যটন প্রসার প্রয়োজন। অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করলে সমবায় পর্যটন শিল্পের যাত্রা আরও সম্প্রসারিত হবে। গ্রামের মানুষদের মধ্যে মমত্ববোধ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, একতা, সাম্য বৃদ্ধি হবে যা বর্তমানে চলমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সমবায়ভিত্তিক পর্যটন অবদান রাখবে এবং বাস্তবায়ন হবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা।

ড. সন্তোষ কুমার দেব: চেয়ারম্যান, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
email: santus@du.ac.bd

নিজ মাঠের ফসল বঙ্গবন্ধুর
হাতে তুলে দিচ্ছেন এক কিষাণী

বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা ও আমার ইচ্ছাবাড়ি

মোখলেছুর রহমান

পাঠ ও পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ১৯৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে একটি সমবায়ভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার সমকালীন অবয়বের নাম সমবায়ভিত্তিক পর্যটন যোজনা ইচ্ছাবাড়ি। ইচ্ছাকর্মী, ইচ্ছাপুঁজি, ইচ্ছাপণ্য ও ইচ্ছাভোক্তা নিয়ে পরিচালিত ইচ্ছাবাড়িগুলো গ্রামে বটম টেন অ্যাপ্রোচ (Bottom Ten Approach)-এর মাধ্যমে পালমা অনুপাত বাস্তবায়ন করবে। ফলে উৎপাদন ও সুষম বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ন্যায্যতা, নারীর ক্ষমতায়ন ও সাধারণের মর্যাদা সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে কল্যাণ, মানবিকতা ও শান্তিময়তার পরশ ছড়িয়ে দিবে গ্রামগুলো। সমবায়ের মাধ্যমে পর্যটন বাস্তবায়ন করা গেলে এদেশে তৃতীয় বিপ্লবের সূচনা হবে।

এসডিজি ধরা দিবে ইচ্ছাবাড়ির উন্নয়ন জালে।

ভূমিকা

চিলির নাগরিক ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রফেসর জোসে গ্যাব্রিয়েল পালমা (Prof. Jose Gabriel Palma)-ও নজরে আসে যে, জনগোষ্ঠীর নিম্নতম স্তরের ৪০% মানুষের আয় ও ঊর্ধ্বতম স্তরের ১০% মানুষের আয়ের মধ্যে বিশাল ফারাক রয়েছে। তাই একটি জনগোষ্ঠীর গড় আয় কখনো তাদের প্রকৃত আয়কে নির্দেশ করে না। ফলে সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির পরিবর্তে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ব্যাপক আধিপত্য চলতে থাকে এবং সমাজে অনাচার, নিপীড়ন ও অস্থিরতা বিরাজ করে। এই কারণে ঊর্ধ্বতম স্তরের ১০% ও নিম্নতম স্তরের ৪০% মানুষের আয়ের অসমতা দূর করার পক্ষে তিনি মত দেন। তাঁর এই মত পালমা প্রপোজিশন (Palma Proposition) নামে খ্যাত। পরবর্তীতে পালমা প্রপোজিশন থেকে পালমা অনুপাত নির্ধারণ করা হয়। ঊর্ধ্বতম স্তরের ১০% মানুষের আয় দিয়ে নিম্নতম স্তরের ৪০% মানুষের আয়কে ভাগ করলে যে অনুপাত পাওয়া যায়, একে পালমা অনুপাত বলে। ২০১৫ সালে এসডিজির ১০ নম্বর লক্ষ্য প্রণয়নকালে পালমা অনুপাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মতে, পর্যটন ছাড়া পালমা অনুপাত বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই তারা ২০২১ সালে বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে পর্যটন (Tourism for Inclusive Growth)। এদেশে তা বাস্তবায়নের জন্য সমবায়ভিত্তিক পর্যটনের সূচনা ও অনুশীলন অপরিহার্য।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা

পালমা প্রপোজিশন ও বঙ্গবন্ধুর শোষিতের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে রাজনৈতিক অর্থনীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর ৪০ থেকে ৭০ দশকের পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য প্রকট ছিল, যা বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তায় ফুটে ওঠে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমানকে কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। হয়তো এই সময়েই তাঁর মাথায় সমবায়ের বীজ গভীরভাবে প্রোথিত হয়, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকালে এর দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বর্ণনাকালে ১৩ নং অনুচ্ছেদে মালিকানার নীতি নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয় :

উদ্ধৃত ''উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে :

ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।'' অনুদ্ধৃত

আমাদের সংবিধানে সমবায়কে এরূপে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। সমবায়ী মালিকানা নির্ধারণের মধ্য দিয়ে জনগণের অর্থনীতি ও ক্ষমতাকে দেশের সর্বোচ্চ আইনে স্বীকৃতি পৃথিবীতে এক বিরল ঘটনা।

অতঃপর ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দুধের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিতে দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালে সমবায় বিভাগ যানবাহন ও পরিবহণ সমবায় সমিতি গঠনের দিকে মনোনিবেশ করে। ফলে বাংলাদেশ গণপরিবহণ চালক সমবায় সমিতি ও পরে বাংলাদেশ অটো রিকশা চালক সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। আইআরডিপি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মহিলা সমবায় সমিতি গঠন শুরু করে।

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়াদী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু এক ভাষণে বলেন '.. কিন্তু একটা কথা এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি, তাতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বৎসরের প্লানে বাংলাদেশের পঁয়ষট্টি হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে কাজ করতে পারে, তাকেই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলে যারা টাউট আছেন তাদেরকে বিদায় দেওয়া হবে..।'

তাঁর ভাষণের বর্ণিত অংশে সুস্পষ্ট যে, সমবায়ের মাধ্যমে সাধারণের মাথার ওপর ছাতা মেলে ধরতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

তৎপরতীকালে বাঙালির জীবনরেখায় নতুন নতুন ধারণা জন্ম নিয়েছে। মানুষের জীবনযাপনের নানাবিধ উপাদান তৈরি হয়েছে এবং পর্যটন হয়ে ওঠেছে জীবন ও অর্থনীতির অন্যতম উপাদান। পর্যটন বর্তমানে মানুষের জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও চেতনার জায়গাকে শাণিত করছে। বাস্তবায়ন করছে উন্নয়নের সকল এজেন্ডাকে। এটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শিল্পও বটে।

পর্যটনে সমবায়

পর্যটনের স্বাভাবিক অবদানের পাশাপাশি উচ্চতর অবদানগুলো এরই মধ্যে সকলের দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করেছে। গ্রামীণ জীবনের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হচ্ছে পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতি। এদের কর্মপরিকল্পনার গভীরতা ও বহুমুখীতা পর্যটনকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাবে। জাতির পিতার দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল রাষ্ট্রের তিনটি ভিত্তি কাঠামোর বেশ কিছু ধারাবাহিক সংস্কার। সমকালীন অবস্থায় সমবায়ের মাধ্যমে পর্যটন বাস্তবায়ন করা গেলে এদেশে তৃতীয় বিপ্লবের সূচনা করতে পারে।

পর্যটনের সাথে সমবায়ের আইনি সংযুক্তির অনেকে এর নতুন অবয়বের দিকে তাকিয়ে আছেন। কৃষি পর্যটন, খাদ্য পর্যটন, জলাভূমি পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন, স্বাস্থ্য পর্যটন ও জীবনধারা পর্যটন— এই ৬ ধরনের পর্যটনের সমন্বয়ে একটি পর্যটনস্থানে নতুন ২ ধরনের পর্যটন দর্শন অর্থাৎ গুরুবাস ও ইচ্ছাবাড়ি যুক্ত করা হলে তা প্রথাগত পর্যটনকে ভেঙে তৈরি করবে নতুন অবয়ব। ফলে পর্যটনের সৃজনশীলতা একে স্মরণ ও অনুসরণের বিষয়ে উন্নীত করবে। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, গুরুবাস ও ইচ্ছাবাড়ির যুগল প্রভাব আগামীর পর্যটনকে অর্থনীতি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশ রক্ষার হাতিয়ারে পরিণত করবে।

গুরুবাস দর্শন

এই ধারণা ও দর্শন স্থানীয় মানুষের জীবনধারা থেকে উৎসারিত। হাজার বছরের জীবনধারা, যাপনরীতি ও উদযাপনের আনন্দ নিশ্চিত করেছে যে, মানুষের এই সকল অনুশীলন টেকসই। গুরুবাস বঙ্গীয় জীবনধারার অভিজ্ঞতার নতুন দর্শনতত্ত্ব। এখানে সম্পদ, জ্ঞান ও মর্যাদা একীভূত হয়েছে যা সমাজজীবনে সমস্বত্ব প্রভাব ফেলতে সক্ষম। সাধারণ মানুষের সকল অভিজ্ঞতাকে অন্যের চৈতন্য বিকাশে প্রয়োগের এক দর্শনতাত্ত্বিক চিন্তার আয়োজন এই গুরুবাস। এর মৌলিক চেতনা দায়িত্বশীল পর্যটনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ও সমাজে বিশুদ্ধতা, স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষণে প্রেরণা জোগাবে।

আমরা সকলেই জানি যে, সমসাময়িককালে মানুষের ওপর সাম্যহীন কৃত্রিম ও কর্পোরেট ধারা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষ ও সমাজ ভারাক্রান্ত হয়েছে। সমাজের মূল বুনটে ফাঁটল ধরেছে। তাই সময় এসেছে মানুষের জীবনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত জ্ঞান ও বৈচিত্র্যকে অনুসন্ধান করে তা দিয়ে সুখের নিবাস তৈরি করার। এই কাজের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবে চিরন্তন গুণী মানুষেরা, যাদেরকে গুরু বলে আখ্যায়িত করা যায়। গুরু ২টি সংস্কৃত শব্দ থেকে জন্মলাভ করেছে। গু অর্থ অন্ধকার এবং রু অর্থ আলো। অন্ধকার থেকে আলোতে নিতে সক্ষম কোনো ব্যক্তি বা সত্তাই গুরু। গুরুবাসের মাধ্যমে জীবন, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির কাছ থেকে নতুন আঙ্গিকে শিক্ষা শুরু হবে। প্রগতিশীলতার মোড়কে উপস্থাপিত হবেন শস্যগুরু, মৎস্যগুরু, খাদ্যগুরু, ধর্মগুরু, শিল্পগুরু, গল্পগুরু, পর্যটনগুরু প্রমুখ।

এই গুরুবাসকে কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠবে পর্যটনের অভিনব দর্শনতাত্ত্বিক প্রকাশ গুরুবাস পর্যটন। পর্যটকরা গুরুদর্শনকালে জেনে নিবেন জীবনকে অন্ধকার থেকে আলোতে নেয়ার সেতু নির্মাণের কৌশল।

ইচ্ছাবাড়ি দর্শন

দেশে-বিদেশে সর্বত্রই কমিউনিটিভিত্তিক পর্যটনের কথা বলা হচ্ছে। অনেক দেশ এ নিয়ে কাজ করে সফল দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছে। অনেক গবেষণা হয়েছে এই বিষয়ে। কিন্তু এখনো নিগূঢ় তত্ত্ব বের করা সম্ভব হয় নাই, যা দিয়ে একে সবখানে টেকসই অবস্থায় পরিচালনা করা যাবে। বিশেষত আমাদের দেশ যেখানে পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আর্থিক সংকট মানুষকে জন্ম থেকেই পীড়া দিচ্ছে - সেখানে একটি জনগোষ্ঠীর সকল মানুষকে কমিউনিটিভিত্তিক পর্যটনের ছায়াতলে আনা দুরূহ। আবার কারুরই অজানা নয় যে, মানুষের ইচ্ছার চেয়ে বড় কোনো শক্তি ও সম্পদ নাই। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, উপর্যুপরি নির্যাতনে মানুষের সব ইচ্ছা মরতে বসেছে। ইচ্ছাহীন বিদ্বান ও কর্মীরাও সমাজের বোঝা হয়ে যাচ্ছে। তাই সাধারণের মধ্যে কেবল ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই সব বড় কাজ করা সম্ভব। সময়ের আর্শিতে পরীক্ষিত এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে অনুসন্ধানে পথ উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যেই ইচ্ছাবাড়ি ধারণার সৃষ্টি। এর মাধ্যমে খুঁজে বের করা হবে ইচ্ছুক নারী ও পুরুষদেরকে। পর্যটনের মতো একটি জীবনমুখী, প্রগতিশীল ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডে কেবল নিবিড় ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারলেই অগণিত মানুষের কর্মসৃজন সম্ভব।

ইচ্ছাবাড়ি একটি বাস্তুদর্শন (Ecological Philosophy)। ইচ্ছাকর্মীদের প্রগতিশীল ইচ্ছাগুলো এই দর্শনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। বহুমাত্রিক কর্মসৃজন মানুষকে যুক্ত করবে এর মূল মেরুরজ্জুতে। নতুন আশা, আস্থা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পণ্য ভাণ্ডারের উৎকর্ষ সাধিত হবে। স্বাধীনতা, আনন্দ, সৃজনশীলতার প্রকাশ মানুষকে মুগ্ধ করবে। ইচ্ছাবাড়ি হবে পর্যটনস্থান, বাস্তুদর্শন ও নতুন জব ফ্যাক্টরি। অর্থাৎ আমাদের দেশে পর্যটন কর্মসৃজনে একটি মডেল হিসেবে পথ দেখাবে।

ইচ্ছাবাড়ির বটম টেন অ্যাপ্রোচ

জনগোষ্ঠীর তলায় পড়ে থাকা ১০% মানুষকে বলা হয় বটম টেন। এরা সমাজের দৃষ্টিতে অকর্মণ্য, তাই অসহায়। এদের ধার করার যোগ্যতা (Credibility) নাই, তাই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খায়। এরা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করে না, তাই সাধারণ উৎপাদন চক্রে এদের অংশগ্রহণ খুব কম। কিন্তু এদের রয়েছে পোড় খাওয়া জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা। এরা অক্রিয়াশীল, অনড় ও অনৈক্যে আবদ্ধ। ফলে তথাকথিত নিরাপত্তা বলয়ের (Safety Net) আওতায় এনে এদেরকে ক্রিয়াশীল ও উৎপাদনশীল করা যাবে না।

পালমা অনুপাতের মধ্যকার দূরত্ব কমাতে হলে প্রথমে বটম টেন অ্যাপ্রোচ (Bottom Ten Approach)-এর মাধ্যমে নিম্নতম স্তরের ১০% মানুষকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাজে যুক্ত করতে হবে। সমবায়ভিত্তিক পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে ইচ্ছাবাড়ি এদেরকে অর্থনীতির অগ্রদূত হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কেবল উদ্বুদ্ধ করা, সামান্য আর্থিক সহযোগিতা বা সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এনে পালমা অনুপাত বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাদের চোখে নতুন আলোর ঝলকানি সৃষ্টি করে অনড়, অসাড় ও ভঙ্গুর বটম টেনকে পর্যটনের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে।

ইচ্ছাবাড়ির উপাদান

ইচ্ছাবাড়ি একটি পর্যটনস্থান যেখানে পর্যটনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসম্পাদনের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সকল ইতিবাচক ইচ্ছা সমন্বয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয় সুসংহত করে জীবনের উৎকর্ষ সাধনের সার্বিক প্রয়াস চালানো হয়। ইচ্ছাবাড়ির অর্থনৈতিক, মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ এর কার্যকর অঙ্গ। মোট ৪ (চার)টি উপাদান অর্থাৎ ইচ্ছাকর্মী, ইচ্ছাপুঁজি, ইচ্ছাপণ্য ও ইচ্ছাভোক্তার সমন্বয়ে ইচ্ছাবাড়ি পর্যটনের জব ফ্যাক্টরি হিসেবে অবদান রাখবে। মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের সার্বিক রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে ইচ্ছাবাড়ি। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি গ্রামে একটি করে ইচ্ছাবাড়ি স্থাপিত হবে। এর নামকরণ হবে গ্রামের নাম যুক্ত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ইচ্ছাবাড়ি *চারিপাড়া।*

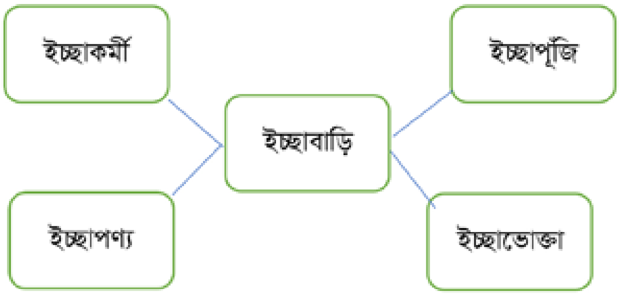

ইচ্ছাবাড়ির উপাদানসমূহ

ক. ইচ্ছাকর্মী : পর্যটনের নানা ধরনের পণ্য ও সেবা উৎপাদনে ইচ্ছুক নারী-পুরুষেরা ইচ্ছাকর্মী হিসেবে বিবেচিত হবেন। প্রতিটি নারী ও পুরুষের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের সক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলবে ইচ্ছাবাড়ি। একজন ইচ্ছাকর্মী কোনো অবস্থাতেই বৈষম্যের শিকার হবেন না। গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধের প্রয়োগ হবে ইচ্ছাবাড়ির কর্মী বাছাই ও কর্মবণ্টনের ক্ষেত্রে। ইচ্ছাকর্মীরা তাদের ইচ্ছার একক ও যৌথ ইচ্ছা বাস্তবায়নের সুযোগ পাবেন। এখানে ইচ্ছাকর্মীর সংখ্যা নির্ধারণ ও ইচ্ছা বহির্ভূত কর্ম নির্ধারণ ও বণ্টন করা হবে না। একটি গ্রামের সকল সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য ইচ্ছুক যেকোনো সংখ্যক কর্মীই এখানে নিয়োজিত হতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, ইচ্ছাকর্মীদের কোনো কাজ চাকরি হিসেবে বিবেচিত হবে না। যেকোনো বয়সের স্থানীয় মানুষের ইচ্ছা বাস্তবায়নের সূতিকাগার হবে ইচ্ছাবাড়ি। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি ইচ্ছাকর্মীকে সমবায় সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করতে হবে। তবে সদস্য নন এমন গ্রামবাসীরাও ইচ্ছাবাড়ির সাথে শর্তসাপেক্ষে যুক্ত থাকতে পারবেন।

খ. ইচ্ছাপুঁজি : সকল ইচ্ছাকর্মী নিজেদের ইচ্ছা ও সাধ্যমতো ক্ষুদ্র কিংবা মাঝারি পুঁজির যোগান দিবেন। এই পুঁজি সংগ্রহে

পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতি পূর্ণ আইনগত ও দাপ্তরিক সহায়তা প্রদান করবে। গ্রহণযোগ্য হিসাব পদ্ধতির মাধ্যমে অ্যাকাউন্টস্ ও বিনিয়োগ পরিচালিত হবে। সমবায় আইন ও বিধি মেনে সদস্যবহির্ভূত ব্যক্তিগণও ছোট ছোট প্রকল্পে পুঁজি সরবরাহে এগিয়ে আসতে পারবেন। পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতির ইচ্ছাকর্মীরা চাইলে নিয়ম মেনে ঋণ ও পুঁজি সংগ্রহ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ইচ্ছাপুঁজি সৃজনে যথেষ্ট আইনি উদারতা আছে।

গ. ইচ্ছাপণ্য : ইচ্ছকর্মীরা তাদের পছন্দের কাজের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবাই ইচ্ছাপণ্য। পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতি চাহিদামতো পণ্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে, যাতে চাহিদা মতো মানসম্মত পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা যায়। বাজার ও ক্রেতা ধরে রাখার জন্য প্রতিটি ইচ্ছাকর্মীকে ইচ্ছাপণ্য উৎপাদনে পেশাদারিত্ব ও সৃজনশীলতা দিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইচ্ছাপণ্যের ধরন ও পরিমাণে কোনো সীমারেখা নাই। ইচ্ছাকর্মীদের ইচ্ছা, সক্ষমতা ও পেশাদারিত্বের উপর ইচ্ছাপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ নির্ভরশীল। ইচ্ছাপণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের প্রতিটি ধাপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিতে রাখতে হবে।

ইচ্ছাবাড়িগুলো পর্যটন আবাসন, খাদ্য, বিনোদন, গাইড ইত্যাদিসহ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নিত্যব্যবহার্য স্বাস্থ্য সম্মত দ্রব্য, পোশাক, হস্তশিল্প ও সুভেনির ইত্যাদির মজুদ সংরক্ষণ করবে। খাদ্য পণ্যের গায়ে উপাদান, প্রস্তুতকারী, প্রস্তুতি ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং নিরাপত্তা ও স্ট্যান্ডার্ড সিল উৎকীর্ণ থাকবে। ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতি প্রতিটি পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণ করে দিবে।

ঘ. ইচ্ছাভোক্তা : ইচ্ছাবাড়ির সকল পণ্য ও সেবার প্রাথমিক ভোক্তা হবেন পর্যটকরা। তবে স্থানীয় ভোক্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণও ইচ্ছাভোক্তা হিসেবে গণ্য হবেন। এরা সকলেই পছন্দ ও ইচ্ছানুযায়ী ক্রয় করবেন। ইচ্ছাপণ্য উৎপাদন নির্ভর করবে ইচ্ছাভোক্তাদের চাহিদার ওপর। ইচ্ছাভোক্তাদের সন্তুষ্টি ইচ্ছাবাড়ির সার্বিক উৎসাহ হবে ইচ্ছাপণ্য উৎপাদনের প্রধান ভিত্তি। ইচ্ছাভোক্তা সংগ্রহে পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতির প্রতিটি ইচ্ছাবাড়ি পণ্য ও সেবার প্রচারণা, ভোক্তা অধিকার আইন পরিপালন, পণ্যের গুণগত মান রক্ষা ও পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত ইত্যাদি দয়িত্ব পালন করবে। সকল অবস্থায় ক্রেতার সন্তুষ্টিকে শূন্য সহিষ্ণুতায় দেখবে ইচ্ছাবাড়ি।

ইচ্ছাবাড়ির আকর্ষণ

প্রতিটি ইচ্ছাবাড়ি গ্রামীণ পরিবেশে তৈরি হবে। এদের প্রত্যেকের আলাদা আকর্ষণ থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। তবে গ্রামের প্রকৃত অবয়ব, মূল পেশা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন না করে উদ্ভাবনীমূলক জ্ঞান দিয়ে ইচ্ছাবাড়িতে পর্যটন আকর্ষণ সৃষ্টি করা হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, গফরগাঁওয়ের বারবাড়িয়া পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড এর কর্মএলাকার ১৩টি গ্রামে ১৩টি ইচ্ছাবাড়ি স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ আকর্ষণ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ইচ্ছাবাড়ির নাম	আকর্ষণসমূহ
ইচ্ছাবাড়ি চারিপাড়া	স্থানীয় খাবার, পিঠা ও পানীয়।
ইচ্ছাবাড়ি মাইজহাটি	লোক জাদুঘর ও লোকজ উপাদানের সংগ্রহ।
ইচ্ছাবাড়ি সুবর্ণপুর	বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহের ছবি ও রেপ্লিকা।
ইচ্ছাবাড়ি পাড়াভূম	বিশেষ ব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক চিরায়ত সৌন্দর্য সংরক্ষিত থাকবে।
ইচ্ছাবাড়ি লক্ষ্মণপুর	স্থানান্তরযোগ্য সাংস্কৃতিক স্থাপনা ও ঐতিহ্য।
ইচ্ছাবাড়ি হাট পাড়াভূম	স্থানীয় হস্তশিল্প দিয়ে সজ্জিত থাকবে।
ইচ্ছাবাড়ি বাগবেড়	লোকজ ও চিরায়ত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে।
ইচ্ছাবাড়ি পাকাটি	উৎসব উপাদান দিয়ে সজ্জিত করে রাখা হবে।
ইচ্ছাবাড়ি বারবাড়িয়া	লোকজ সংগীত ও কলা পরিবেশনার আয়োজন থাকবে।
ইচ্ছাবাড়ি বাড়া	দেশের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সংগ্রহ সংরক্ষিত থাকবে।
ইচ্ছাবাড়ি	আঞ্চলিক ভাষাভাষীর প্রতিনিধিত্ব, কৃত্রিম জীবনধারা, রীতি, আচার ইত্যাদি
ইচ্ছাবাড়ি	প্রধান প্রধান নৃগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও জীবনধারা প্রদর্শিত হবে।
ইচ্ছাবাড়ি	গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন থাকবে।

অধিকন্তু ইচ্ছাভোক্তাদের চাহিদা ও ইচ্ছাকর্মীদের উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা নতুন নতুন আকর্ষণ সৃষ্টি হবে। যেমন ১৩০ প্রকার দেশি পিঠার বৃহত্তম প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠান, গুরুবাস কেন্দ্রিক গুরু সম্মেলন, স্থানীয় নারীদের তৈরি দেশের বৃহত্তম অলংকার প্রদর্শনী, বৃষ্টির পানি ধরে রেখে তা দিয়ে পর্যটকদেরকে আপ্যায়ন, স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত সোয়ার্ম ড্রোন দিয়ে রাতে শো অনুষ্ঠান, ব্রহ্মপুত্র নদে বজ্রায় রাত্রিযাপন ইত্যাদি বহুবিধ আকর্ষণ সৃষ্টি করবে বারবাড়িয়া পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড।

ইচ্ছাবাড়ি পরিচালনা পদ্ধতি

প্রতিটি ইচ্ছাবাড়ি পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতির আওতাধীন থেকে ইচ্ছাকর্মীদের দ্বারা নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হবে। সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদের সমান্তরালে ৩ বছরের জন্য ৫ সদস্যের নিম্নরূপে ইচ্ছাবাড়ির ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে।

আহ্বায়ক ১ জন, যুগ্ম-আহ্বায়ক ১ জন, সদস্য ২ জন ও সদস্য সচিব ১ জন।

ইচ্ছাবাড়ির কার্যাবলির সাথে অর্থনীতি ও বাণিজ্যায়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। বিধায় ইচ্ছাবাড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সম্মানী প্রদান করতে হবে। এছাড়াও সুষ্ঠুভাবে বাণিজ্যিক কার্য পরিচালনার জন্য ইচ্ছাকর্মীদের প্রত্যক্ষ প্রয়াসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক, দক্ষ বিক্রয়কর্মী, কারিগরি ও প্রশাসনিক কর্মী নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

ইচ্ছাবাড়ি পরিচালনা নির্বিঘ্ন করার জন্য এর অটোমেশন দরকারি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারলে উত্তম। গতিশীলতা ও পূর্ণসেবা প্রদানের লক্ষ্যে পর্যটনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ডিজিটাল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস্, বায়োলজিক্যাল ও জেনেটিক প্রযুক্তি, বায়োমিমিক্রি

এবং পর্যটনে ব্যবহার্য টুলস্ ও ডিভাইসসমূহ এখানে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হবে।

নারীর ক্ষমতায়নে ইচ্ছাবাড়ি

গণমানুষের ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান সম্ভব। কিন্তু এ বিষয়ে রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা, ইচ্ছাশক্তির অভাব এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি। অথচ বৈষম্যমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে সবার আগে প্রয়োজন এই মনোজাগতিক পরিবর্তন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার বোধ ক্ষমতায়নের ধারণা সৃষ্টি হয়। ক্ষমতায়নে শিক্ষার মাধ্যমে নারীর সম্মান বাড়াতে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাক্ষরতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়। নারীর ক্ষমতায়ন নারীর নিজস্ব মূল্যবোধকে বিকশিত করতে সাহায্য করে।

ক্ষমতায়ন বলতে মূলত স্বাধীন ও সুচিন্তিতভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকেই বুঝায়। ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির নিজের জীবন, সমাজ ও নিজের সম্প্রদায়ের জন্য শক্তি সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ক্ষমতায়ন নারীর শিক্ষা, পেশা ও জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার সুযোগ লাভে সক্ষমতা বাড়ায়। তাই এই প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাবাড়ি গ্রামের সাধারণ নারী-পুরুষদেরকে যুক্ত করবে। ফলে সংযুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হবে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাধারণের সম্পৃক্ততা তৈরি অত্যন্ত জরুরি।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতি এর সকল ইচ্ছাবাড়ির নারী সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে নিম্নরূপে একটি নারী পর্যটন সংসদ গঠন করবে।

সংসদের নাম : নারী পর্যটন সংসদ
সদস্য সংখ্যা : ২০০
নির্বাচিত নারী সদস্য : ১৮২ জন
নির্বাচিত নারী সদস্য কর্তৃক মনোনীত পুরুষ সদস্য : ৬ জন
পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি : ৮ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী

উল্লেখ্য যে, ব্যবস্থাপনা কমিটির ১২ জন সদস্য সংসদের ট্রেজারি বেঞ্চে বসবেন। সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৬ জন পুরুষ সদস্য, সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা নির্বাচন করা হবে। সমিতির সভাপতি পুরুষ হলে বিরোধী দলীয় নেতা হবেন একজন নারী।

একটি সংসদ সচিবালয় থাকবে। যারা স্পিকারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এজেন্ডা চূড়ান্তকরণ করবে। প্রতি মাসে ২-৩ দিনের জন্য একবার সংসদ বসবে। পুরো ইউনিয়নের পর্যটনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যেকোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিবে এই নারী সংসদ। সংসদে নারী সদস্যদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার জন্য তাদের ভোটে যেকোনো সিদ্ধান্ত পাস হবে। সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন ট্রেজারি বেঞ্চের ১২ জন সদস্য। সাথে অবশ্যই সংসদের সকল নারী-পুরুষ সদস্যগণ থাকবেন।

নারীরা পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত সমস্যাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাইরে এসে বাস্তবায়ন করার সুযোগ পাবেন। এই পদ্ধতি নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের ব্যতিক্রমী আয়োজন বটে। প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ উপজেলার যেকোনো কর্মকর্তাকে সংসদে আলোচনার সুবিধার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

ইচ্ছাবাড়ির দর্শনতাত্ত্বিক প্রয়াস

ইচ্ছাবাড়ি একটি বাস্তদর্শন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাসস্থানের সকল প্রাকৃতিক মূলধনের বণ্টন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে প্রতিটি ইচ্ছাবাড়ি। এইসব প্রাকৃতিক মূলধনের উপর মানুষ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণি বেঁচে আছে এবং এদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে। একইভাবে ইচ্ছাবাড়ি মানুষ ও সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণসাপেক্ষে পর্যটনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করে। কারণ জীবনের প্রতিটি উপাদানই পর্যটন পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়। তাই জীবন ঘনিষ্ঠ পর্যটনের জন্য পর্যটন ঘনিষ্ঠ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তাহলে স্বাগত জনগোষ্ঠীর পরিপুষ্ট জীবন ব্যবস্থা আগামী দিনে সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। আমরা সকলেই জানি যে, গ্রামীণ মানুষের জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা আছে এবং এরা কম সম্পদে কায়ক্লেশে দিনযাপন করতে সক্ষম। ফলে তাদের তৈরি প্রত্যেকটি পণ্য হবে অভিজ্ঞতাপণ্য। এই সকল পণ্যের ক্রয় ও ভোগের মধ্য দিয়ে ইচ্ছাভোক্তারা অনুপম অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। ইচ্ছাবাড়ি আগামী দিনের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিশ্চিত করবে। কারণ, সমবায়ভিত্তিক পর্যটন ব্যবস্থা সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

উপসংহার

সবশেষে এইটুকু বলা যায় যে, অনেকগুলো তত্ত্বের অনুশীলন করবে ইচ্ছাবাড়ি। সামাজিক সংগঠনতত্ত্ব অনুশীলনের মাধ্যমে ইচ্ছাবাড়ি ইতিবাচক সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোকে সচল রাখবে, সমাজের শোষণ রোধ করবে ও সাম্য বজায় রাখবে। প্রসারণতত্ত্ব অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিগত ও জ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রসারণ এবং চেতনাগত বিস্মৃতি সৃষ্টি হবে। একইভাবে পণ্যায়ন তত্ত্বের মাধ্যমে উৎপাদিত সকল ইচ্ছাপণ্য জীবনের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি ও সুষমভাবে বন্টিত হবে। পুঁজির কল্যাণকর ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হবে। মোটকথা, ইচ্ছাবাড়ি সমাজের সকল দর্শন ও তত্ত্ব ব্যবহার করে মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল নিশ্চিত করার প্রয়াসরূপে আবির্ভূত হবে। এসডিজির প্রায় সব লক্ষ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হবে একটি গ্রামের সাধারণ মানুষ দ্বারা গড়ে ওঠা ছোট্ট একটি ইচ্ছাবাড়ি।

টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদনে সমবায়

ড. কাজী রেজাউল ইসলাম

টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদনে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে সমবায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কৃষকের আয়বৃদ্ধির জন্য সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাত প্রসারের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় কৃষি নীতিতে সমবায় প্রচলন ও প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন, সম্প্রসারণ সেবা গ্রহণ, কৃষি উপকরণ সংগ্রহ, কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার, ঋণ প্রাপ্তি, ফসল উৎপাদন এবং কৃষিপণ্য বিক্রয়ে উৎসাহিত ও সহায়তা প্রদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

টেকসই কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি, প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে এলাকাভিত্তিক সমবায় উদ্যোগ সহায়তা করে। সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। অধিকাংশ কৃষি পরিবারের মালিকানাধীন আবাদি জমির আয়তন সীমিত হওয়ায় একক উদ্যোগে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগে সাধারণত আশাপ্রদ

ফলাফল পাওয়া যায় না। এলাকাভিত্তিক উদ্যোগ ব্যতিরেকে মৃত্তিকা, পানি ও অন্যান্য কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সফলতা অর্জন পরোপুরি সম্ভব হয় না। কৃষি উন্নয়নে সমবায়কেন্দ্রিক উদ্যোগ যে শুধুমাত্র নতুন প্রযুক্তির দক্ষ প্রয়োগে কৃষকদের উৎসাহিত করে তা নয়, উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো উৎপাদন ব্যয় কমাতে সহায়ক হয়। উৎপাদনশীল প্রযুক্তি ব্যবহার প্রসার ও লাভজনক কৃষি উৎপাদনে মৌলিক উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। সাংগঠনিক শক্তি ও অভিজ্ঞতা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বহুমুখী করে তোলে। বিভিন্ন দেশে কৃষি উন্নয়নে সমবায় কার্যক্রম অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্ধিত হয়ে প্রসারিত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতার ওপর প্রভাব পড়ছে। কৃষি উৎপাদন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভূমি শ্রেণি ও জমির প্রকৃতি অনুযায়ী ফসল বিন্যাস নির্ধারণ, ফসল ও ফসলের জাত নির্বাচন, সার প্রয়োগ হার নির্ধারণ এবং রোগ ও কীটপতঙ্গ দমনে সমবায়ভিত্তিক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন আবাদি জমির যথাযথ ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অধিক সহায়ক হয়। কৃষকদের আগ্রহ ও আস্থা সৃষ্টি করে। কৃষি উপকরণের সঠিক ও যথাযথ ব্যবহারে সুবিধা হবে। পরিকল্পিতভাবে পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সংরক্ষণ ও সেচ পানি সরবরাহ, সেচ দিয়ে আবাদের জন্য মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ফসল নির্বাচন পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়ক হয়। জলবায়ু সহিষ্ণু ও স্থানীয় এলাকা উপযোগী কৃষি উৎপাদন ও প্রযুক্তি বিস্তারের সাথে সাথে টেকসই কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করে। চাষাবাদে সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধান সহজতর হয়। সমবায় উদ্যোগে ফসলের বীজ ও চারা উপাদন এবং বিতরণ ও বিনিময়ে কৃষকেরা লাভবান হয়। কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার, বীজ বপন, চারা রোপণ, সেচ পানি বিতরণ, ফসলের পরিচর্যা, কর্তন, মাড়াই ও বিক্রয়ে সুবিধা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ সেবা, ঋণ বিতরণ, ভর্তুকি প্রদান ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান সহজ ও নিশ্চিত করবে। সমবায় উদ্যোগে নির্মিত ও ব্যবহৃত সেচ, পানি সংরক্ষণ, বন্যা ও নিষ্কাশন অবকাঠামো অধিকতর কার্যকর ও টেকসই হয়। নিজ এলাকা উপযোগী টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন কৃষি উন্নয়ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ উন্নয়নে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়। কৃষি উৎপাদনে সমস্যা সমাধান এবং জলবায়ু সহিষ্ণু ও উপ-প্রকল্প এলাকা উপযোগী নতুন কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রাপ্তির সুযোগ ও সুবিধা বৃদ্ধি পায়। চাষাবাদ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান এবং জলবায়ু সহিষ্ণু ও উপ-প্রকল্প এলাকা উপযোগী উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হয়। ভূমি, মৃত্তিকা ও পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, আবাদি এলাকা বৃদ্ধি, আবাদকৃত শস্যের ও শস্য বিন্যাসের পরিবর্তন, মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও প্রয়োগ, সময়মতো জমি চাষ, বীজ বপন, চারা রোপণ ও ফসল কর্তনে কৃষকেরা অধিকতর লাভবান হয়। কৃষি উৎপাদন ও কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধির সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান এবং পারিবারিক আয়বর্ধনের সুযোগ তৈরি হতে থাকবে। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় নারী কৃষক, বর্গাদার ও কৃষি শ্রমিকদের মতামত ও চাহিদা প্রাধান্য পায়।

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের সহায়তা প্রদানে গ্রাম ও ইউনিয়নভিত্তিক এবং কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও পণ্য বাজারজাতে উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে গঠিত সমবায় সংগঠন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতা সংগঠনগুলোর কার্যক্রম জোরদার করে তুলবে। সংগঠনগুলো সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন এবং বাজারজাতে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করবে। পারিবারিক প্রয়োজন এবং বাজার চাহিদা ও মূল্যের উপর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সুযোগ হবে। চাষাবাদে খরচ মেটাতে মূলধন জোগাতে কৃষকেরা সহযোগিতা পাবে।

নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নত ব্যবস্থাপনায় কৃষি উৎপদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে কৃষিপণ্য বাজারজাত এবং মুনাফা অর্জন কঠিন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। বাজার প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সমবায় উদ্যোগে আবাদি জমির ধরন, সেচ ব্যবস্থাপনা ও খরচ, বন্যা প্রকৃতি, কৃষি শ্রমিকের উপস্থিতি ও মজুরি হার, যন্ত্রপাতি প্রাপ্যতা ও ব্যবহারে ব্যয়, সারের মূল্য, পরিবহণের সুবিধা ও খরচ, বাজার দরে ওঠানামা, ঋণ সুবিধা ইত্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে উৎপাদন পারকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সমন্বিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, জলবায়ু সহিষ্ণু ও উপ-প্রকল্প এলাকা উপযোগী কৃষি উৎপাদন, শস্য বহুমুখীকরণ, শস্য বিন্যাস পরিবর্ধন, ঘাতসহিষ্ণু শস্য জাত ব্যবহার, বীজ ব্যবস্থাপনা, মাটির উর্বরতা রক্ষণাবেক্ষণে, সুষম ও জৈব সার ব্যবহার, রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ফসলের বালাই দমন ও বালাইনাশক ব্যবস্থাপনা, খামার যান্ত্রিকীকরণ, গবাদি পশুসম্পদ উন্নয়ন, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু খামার উন্নয়ন, বায়োগ্যাস উৎপাদন, কৃষি বনায়ন, দুর্যোগ মোকাবেলা ও ফসল সুরক্ষা, কৃষি বিপণন এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নে কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধন কর্মসূচি গ্রহণ কৃষি উৎপাদন লাভজনক করে তোলে। কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য পেয়ে গ্রামের সকল কৃষি পরিবারে আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে সহায়ক হয়। বাজারজাতে সহায়তা প্রদানে পাইকারি ও খুচরা ক্রেতার সাথে সংযোগ স্থাপন, কৃষিপণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা, কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির সুযোগ তৈরি হয়। কৃষিখাতের উন্নয়ন অকৃষিখাতের সাথে এগিয়ে যেতে থাকে।

ড. কাজী রেজাউল ইসলাম: এডিবি, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার ও জাইকা'র সহযোগিতায় এবং এলজিইডি বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রাকার প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উপ-প্রকল্পসমূহে টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে দীর্ঘকাল পরামর্শক হিসেবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

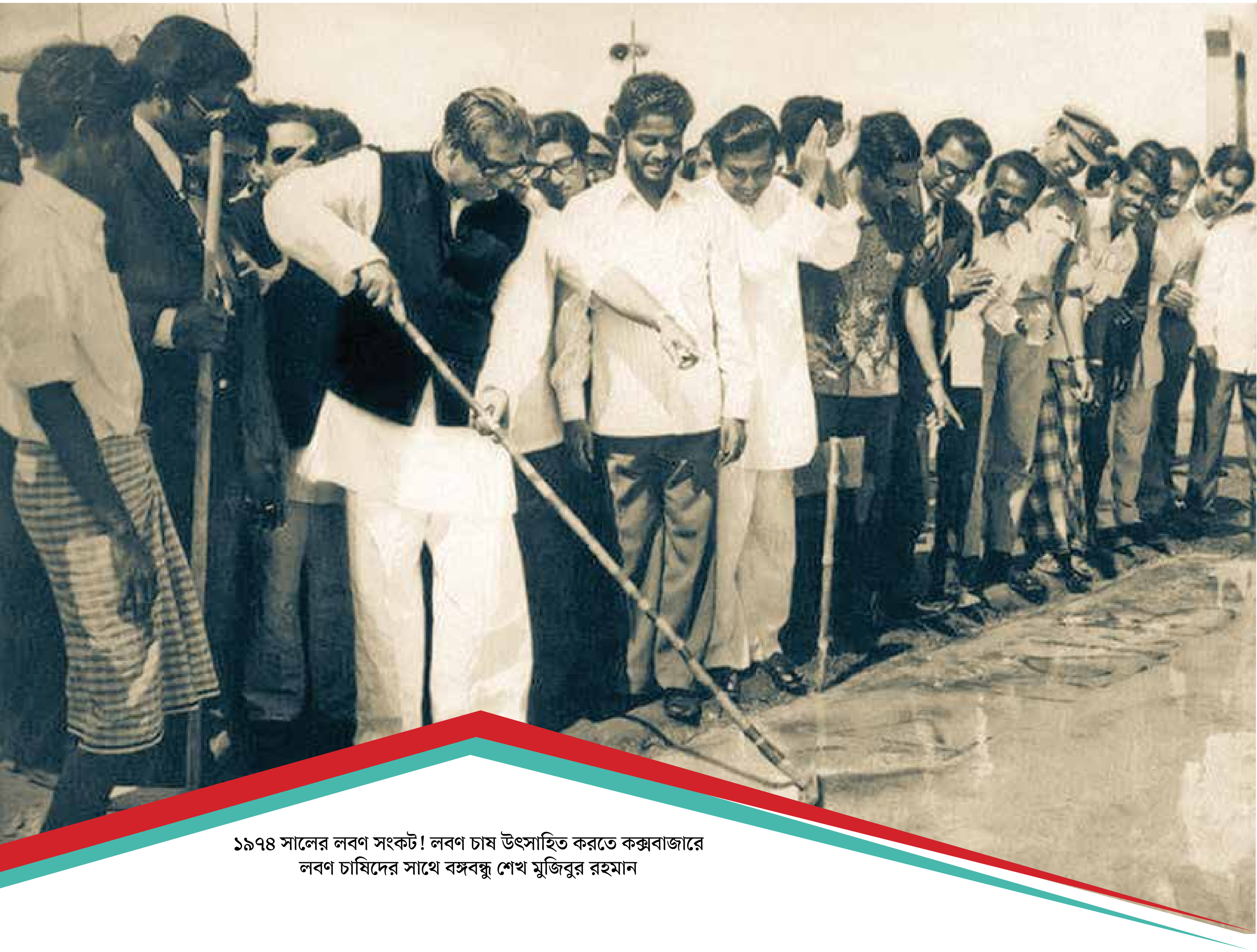

১৯৭৪ সালের লবণ সংকট! লবণ চাষ উৎসাহিত করতে কক্সবাজারে লবণ চাষিদের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার বাস্তবায়ন

প্রেক্ষিত সংস্কার ও আধুনিকায়ন

ড. ফোরকান উদ্দিন আহমদ

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে গণতন্ত্র, সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা, ব্যাপক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ এবং সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস। আধুনিক কৃষির জন্য যে পুঁজি, ঝুঁকি এবং যৌথ মেধার দরকার তার জন্য প্রয়োজন গণমুখী কৃষিভিত্তিক সমবায় ব্যবস্থা। খাদ্য নিরাপত্তা ও মানুষের দারিদ্র্য দূর করতে হলে কৃষি সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই। যথাযথ নীতি, স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিক সহযোগিতা পেলে কৃষি সমবায় খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ

ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টিতে অন্যতম এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হলো সমবায়ী উদ্যোগ। এজন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের জন্য, নিজের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠা। All for each and each for all এই মর্মবাণী ধারণ করে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সারা বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের সকলের একান্ত দায়িত্ব।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। শতাব্দী প্রাচীন এ আন্দোলন বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সমবায়ের চেতনাকে প্রবল ও অর্থবহ করে তুলেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। তিনি দরিদ্র-সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়ের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং সমবায়কে গণমুখী আন্দোলনে পরিণত করার ডাক দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে দরিদ্র, ভূমিহীন, নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে পাঁচটি দুগ্ধ উৎপাদনকারী এলাকায় দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। আজকের মিল্কভিটা তাঁরই সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের ফসল। জাতির পিতা সমবায় পদ্ধতিতে সমন্বিত ও যৌথ খামার প্রচলনের মাধ্যমে উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় রাজস্বে পল্লী উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনকালেই জাতির পিতা সমবায়ের মাধ্যমে এদেশের আর্থ-সমাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষিঋণ বিতরণ- সকল ক্ষেত্রে সমবায় কৌশলকে কাজে লাগিয়ে স্থায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি সংবিধানে সমবায়কে রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন জাতির পিতার ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণার একটি অংশের উদ্ধৃতি তুলে ধরেন- 'গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ এ জমির মালিকের জমি থাকবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার দর্শনকে ধারণ করেই সরকার প্রতিটি গ্রামে সমবায়ভিত্তিক মৎস্য খামারসহ গবাদি পশু, হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুলছে। সামাজিক বনায়ন, সমিতির মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন, তাঁত ও সেলাই, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কুটিরশিল্প, মৃৎশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

দেশে সমবায় আন্দোলন ও গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের স্বার্থে সমবায়কে সমগ্র গ্রাম-ইউনিয়ন পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষি ও ফলমূলভিত্তিক সমবায়, দুগ্ধ খামার সমবায়, মৎস্য খামার সমবায়, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন সমবায়, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পভিত্তিক সমবায় ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা ভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করে একটি সমন্বিত ও সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে তা তদারকি ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব। দেশের সকল জাতীয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতিসমূহকে ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত করতে হবে। সমিতিসমূহ নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করলে ইউনিয়নের অর্থসংকট হবে না। ইউনিয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। সর্বোপরি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সৎ, অভিজ্ঞ, প্রকৃত সমবায়ীদের দ্বারা ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় লোকসানি শিল্প কারখানাসমূহকে সমবায়ের আওতায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালিত করতে হবে। তাহলে লোকসানি খাতসমূহ রাজস্ব আয়ের খাত হিসেবে পরিগণিত হবে। এর মাধ্যমে সমবায়ীরাও দেশের অর্থনীতিতে অন্যতম ভূমিকা রাখতে পারে।

সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা, আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে সমবায় খাতে প্রত্যাশিত অগ্রগতি আজ অবধি দৃশ্যমান হয়নি। সমবায় হিসেবে অন্যতম সফল প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটা এক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেশের জনগণকে এখনও পুষ্টির চাহিদা যোগান দিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনালগ্নে গঠিত সমবায় সমিতিগুলো হয় বন্ধ হয়ে গেছে নয়তো নিষ্ক্রিয় রয়েছে। কিছু সমিতির কার্যক্রম আছে মাত্র। নতুন সমিতি খুব একটা গঠিত হয় না। অথচ সমবায় অধিদপ্তরের আয়োজন কম নয়। সমবায় অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৪,৯৫৯ জন। সমবায় অধিদপ্তরের বিশাল স্থাপনা, জনবল, একাডেমি থাকা সত্ত্বেও চোখে পড়ার মতো নতুন সমবায় গড়ে উঠছে না, জনসাধারণ এর সমবায় সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছে না।

প্রথমত দেশের নিষ্ক্রিয় মৃতপ্রায় সমবায় সমিতিসমূহ পুনর্জ্জীবিত করতে একজন সমবায় বিশেষজ্ঞকে প্রধান করে হাইকোর্টের বিচারপতির মর্যাদা দিয়ে কমিশন গঠন করা যেতে পারে। আরো দুইজন অভিজ্ঞ সমবায়ী ও সমবায় গবেষককে যথার্থ মর্যাদায় কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা যেতে পারে। কমিশন দেশের সমবায় সমিতির বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সমস্যা ও সম্ভাবনা নির্ণয় করে সরকারের কাছে করণীয় প্রস্তাবনা পেশ করবে। যে সকল সমিতি আর পুনর্জ্জীবিত করা সম্ভব নয় তা বিলুপ্ত করার ঘোষণা দেবেন এবং যে সকল সমিতি পুনরায় চালু করা সম্ভব তা কোন প্রক্রিয়ায় চালু হবে তার প্রস্তাবনা সরকারের কাছে পেশ করবেন। যে সকল সমিতিগুলো বন্ধ রয়েছে তার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ারও সুপারিশ করবেন এবং সমবায়ের বেহাত ও বেদখল হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া কমিশন সমবায় অঙ্গনে ন্যায়পালের দায়িত্বও পালন করতে পারবেন। সমবায় অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সমবায়ীদের কোনো অভিযোগ থাকলে তা কমিশনে পেশ করবেন। কমিশন দায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পাশাপাশি দেশের বিদ্যমান সমবায় আইন বিধিমালা প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন এর জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করতে পারবেন। দেশের সমবায় খাতের পুনর্জ্জীবন এবং এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সমবায় কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী একটি পরীক্ষিত স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সব শাখায় সমবায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার ও 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, বিশেষ করে আর্থিক ও সেবা খাতে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও বিদ্যমান কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে সমবায় অধিদপ্তরর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানব

সম্পদ উন্নয়ন বিশেষত নারী উন্নয়নে সমবায় নিকট ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। পৃথিবীতে অনেক উন্নত রাষ্ট্রই সমবায়ের কৌশলকে অবলম্বন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। বাংলাদেশও সমবায়ী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলে, অনুপ্রাণিত হলে ড. আকতার হামিদ খানের প্রণীত পল্লী উন্নয়নের কৌশলকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একমাত্র সমবায়ী চেতনায় মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে যেকোনো কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বিশ্ব দরবারে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে সুনাম ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সমবায় খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

সমবায় আজ মৃতপ্রায় সংগঠনে পরিণত হয়েছে। সমবায়ের কার্যক্রম শুধু কাজের গরু কেতাবে পরিলক্ষিত হওয়ার বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছে। সমবায় আজ বাস্তবতা থেকে দূরে, সংকটের আবর্তে পতিত। সমবায়ের আজ পুনর্জাগরণ দরকার। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন যে, একমাত্র সমবায়ই হয়ে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ স্বনির্ভরতা অর্জন করা সক্ষম। পৃথিবীর উন্নত দেশে সমবায় কাঠামো খুব মজবুত। তারা আধুনিক সমবায়ী ধারণাকে প্রাধান্য দিয়ে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা লাভ করেছে। সেক্ষেত্রে আমাদের পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। কেননা উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অংশীদার আমরাও। ২০৪১ সালে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে আসীন হতে চায় আমরা। এক্ষেত্রে সমবায় আদর্শকে পুরোপুরি জাতীয়করণ করে শক্ত নীতি নির্ধারণী কর্মপস্থার অনুশীলন করে সমবায়কে সুদৃঢ় ভিত্তিতে বাস্তবে রূপদান করতে হবে। অধিকন্তু দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সর্বোপরি সুযোগ্য নেতৃত্ব ও আপসহীন মনমানসিকতায় সমবায়কে প্রাতিষ্ঠানিকতা দিতে এগিয়ে আসতে হবে। ত্যাগী, সৎ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় সমবায় গতি পাবে। তাই অনতিবিলম্বে সমবায় সংস্কার কমিটি গঠনপূর্বক কমিশনের মতামত, সুপারিশ ও প্রস্তাবনার আলোকে সমবায়কে যুগোপযোগীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পরিশেষে আমরা বলতে পারি সমবায় শক্তিশালী হলে দেশে দুর্নীতি বন্ধ হবে। দেশে বেকারত্ব ও অরাজকতা কমে আসবে। এমনকি রাজনৈতিক সহিংসতাও কমে আসবে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমে আসবে। সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। তাই আসুন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সমবায় ভাবনার সফল বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবতার নিরিখে সমবায় অধিদপ্তরকে যুগোপযোগী সংস্কার ও শক্তিশালী করে দ্রুত আধুনিকায়নের যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সমবায় খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করে সরকারকে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

ড. ফোরকান উদ্দিন আহমদ: সাবেক উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, কলামিস্ট ও গবেষক

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় নৃতাত্ত্বিক সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণের চেক বিতরণ করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী

একটি প্রকল্পের সমাপ্তি : আশার ডানায় নতুন প্রত্যাশা

মোঃ জিল্লুর রহমান

২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সকল জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষাকে স্বার্থক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের (৩য় সংশোধিত) আওতায় দেশের সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীভূক্ত মানুষদের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার সাথে সংগতিপূর্ণ আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন' কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হয়।

কম্পোনেন্টের মেয়াদ

জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২১

কম্পোনেন্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন' কম্পোনেন্ট এর মূল লক্ষ্য সমবায়ের মাধ্যমে সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং জীবনধারাকে অক্ষুন্ন রেখে বাজার চাহিদা অনুযায়ী আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা

- প্রতিটি সমবায় সমিতিতে ৪০ জন করে (কম/বেশি) সদস্যভুক্তির মাধ্যমে ১৫টি জেলার ২৯টি উপজেলায় মোট ২৬৫টি সমবায় সমিতি গঠন, নিবন্ধন এবং সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা।
- ১৫টি জেলার ২৯টি উপজেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জনগণের মধ্য থেকে বিশেষভাবে (সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন অনুযায়ী) নির্বাচিত ১০,৬০০ জন পুরুষ ও মহিলাকে প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আয় প্রকল্প শেষে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা।

- ১০৬০০ জন উপকারভোগীকে উদ্বুদ্ধকরণ ও পেশাগত প্রশিক্ষণের আওতায় এনে তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- প্রশিক্ষণ ও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ১০৬০০ জন উপকারভোগীকে প্রকল্প সমাপ্তিতে আত্মকর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা।

কম্পোনেন্টের কর্মএলাকা

দেশের ১৫টি জেলার সমতলের ২৮টি উপজেলায় এ কম্পোনেন্টের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উপজেলাসমূহ হল- টাঙ্গাইলের মধুপুর, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া, নেত্রকোণার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা, শেরপুরের নালিতাবাড়ি ও ঝিনাইগাতী, রাজশাহীর গোদাগাড়ি ও তানোর, নওগাঁর ধামুরহাট, নিয়ামতপুর ও মহাদেবপুর, চাপাইনবাবগঞ্জের সদর, নাচোল ও গোমস্তাপুর, রংপুরের মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ, দিনাজপুরের বিরল, বীরগঞ্জ ও কাহারোল, পটুয়াখালীর কলাপাড়া, বরগুনার তালতলী, সিলেটের গোয়াইনঘাট, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ ও কুলাউড়া, হবিগঞ্জের বাহুবল, কক্সবাজারের সদর ও টেকনাফ উপজেলা।

কার্যক্রম

- দরিদ্র ও অতি দরিদ্র গ্রামবাসীকে সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য Contributory Microsavings কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- প্রত্যেক উপকারভোগী মাসে ২০০ টাকা বা তার বেশি টাকা সঞ্চয় জমা করেন। প্রকল্প থেকে সঞ্চয়ের সমপরিমাণ অর্থ (সর্বোচ্চ মাসিক ২০০) হারে তিনি উৎসাহ সঞ্চয় পান।
- ৪০ জন অতিদরিদ্র/দরিদ্র উপকারভোগীদেরপ্রত্যেকউপকারভোগী কর্তৃক নিজ হিসেবে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে সমপরিমাণ অর্থ প্রকল্প থেকে প্রদান করা হয়। বছরে ব্যক্তি সঞ্চয়ের পরিমাণ হয় ২,৪০০ +২,৪০০=৪,৮০০ টাকা এবং ০২(দুই) বছর মেয়াদে তা দাঁড়াবে ৪,৮০০+৪.৮০০ = ৯,৬০০।
- প্রতিটি সমবায় সমিতিকে বছরে ১, ৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মূলধন সহায়তা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ দুবছরে ৩, ০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা মূলধন তৈরি হয়েছে। এ সকল অর্থ ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য/উপকারভোগীকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্তসাপেক্ষে

সমবায় অধিদপ্তরে ২১ মার্চ ২০২১ খ্রি. তারিখে 'ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্প প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন : সমস্যা ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

১২,৭০০ (বার হাজার সাতশত) টাকা পরিশোধযোগ্য বিশেষ উৎসাহ ঋণ হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে। সদস্যগণ বিশেষ উৎসাহ ঋণ বাবদ গৃহীত অর্থ পরবর্তী মাস থেকে ৩% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প পরিচালকের হিসেবে ১২ মাসের কিস্তিতে পরিশোধ করেন। এই তহবিল আবর্তিত/ঘূর্ণায়মান তহবিল (Revolving Fund) হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অর্জিত সাফল্য (জুন, ২০২১ পর্যন্ত)

- সমবায় সমিতি গঠন- ২৪২টি
- উপকারভোগী সদস্য পরিবার- ৯৬৮০ টি
- নিজস্ব জমাকৃত সঞ্চয়- ২৭৭ লক্ষ টাকা
- সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত কল্যাণ অনুদান- ২৪২ লক্ষ টাকা
- সমিতিতে সরকার প্রদত্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল- ৬৮২ লক্ষ টাকা
- উৎসাহ ঋণ প্রদান- ৭৭৮৫ জন, ঋণের পরিমাণ ৯ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা

প্রশিক্ষণ ও সেমিনার

- সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রশিক্ষণ প্রদান-৭২০০ জন
- প্রণোদনা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান- ৯৫০০ জন
- সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান- ৫৩৯ জন
- আ স প্র ই এ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান- ১৯০ জন

পুরস্কার

সফলভাবে কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নে অবদানের জন্য সহকারী প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও স্থানীয় সমন্বয়কারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং মাঠ সহকারী (ফ্যাসিলিটেটর) ক্যাটাগরিতে মোট ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

আসপ্রই, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহে ‘সমবায় ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

কম্পোনেন্টের সচিত্র কার্যক্রম

প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় মধুপুরে নির্মিত থানারবাইদ তালতলা বসবাসরত নৃতাত্ত্বিক সমবায় সমিতির টিনসেড অফিস ঘর।

সাফল্যের গল্প

টাংগাইলের মধুপুরে পীরগাছা (পশ্চিম) বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য বাবুল নকরেক। এই কম্পোনেন্টের আওতাভুক্ত হওয়ার পূর্বে অন্যের জমিতে দিনমজুরির কাজ করতেন। স্বাভাবিক জীবনযাপনের মত আয় ছিল না তার। অভাব ছিল পরিবারের নিত্যসংগী। পরবর্তীতে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ‘ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন’ কম্পোনেন্ট সম্পর্কে অবহিত হয়ে সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। বাবুল নকরেক ঋণ বাবদ ১২,৭০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বাবুল নকরেক ঋণের টাকা এবং ব্যক্তিগত আয় একত্র করে ২০,০০০ টাকায় বাঁশ ক্রয় করে বাঁশের তৈরি বিভিন্ন কুটিরশিল্পের কারখানা স্থাপন করেন। কারখানার উৎপাদিত পণ্য প্রথমে স্থানীয় বাজারে পরবর্তীতে সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে বিক্রি শুরু করেন। পরবর্তীতে আবর্তক তহবিল হতে ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং মুনাফার টাকা একত্র করে কারখানাটি বড় করেন। কারখানা হতে শতাধিক আইটেমের পণ্য উৎপাদিত হয়। কারখানার আয় হতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে বাবুল নকরেক ২৫ শতাংশ আবাদি জমি ক্রয় করেছেন।

বাবুল নকরেক এখন স্বাবলম্বী

কিছু গল্প কিছু আশা

দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে গহীন অরণ্যে, নদী-সাগর তীরবর্তী ভূমিতে, ছোট পাহাড়ের টীলাতে অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বসবাস। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তাদের জীবনযাপন যথেষ্ট কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় প্রদত্ত সহায়তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প। তদুপরি তারা কঠোর পরিশ্রম ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এ সীমিত ঋণ সহায়তার মাধ্যমে জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

সমতলের খাসিয়া, গারো, সাঁওতাল, রাখাইন, মুরং, ওরাও, হাজং, চাকমা, খুমি, মুন্ডা, কোল, পাহান, কোচ, ডালু, মাহেলি, পাহাড়ি প্রভৃতিসহ ২৭টিরও বেশি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জনগণ এ কম্পোনেন্টের উপকারভোগী। ৪ বছর এ কম্পোনেন্টে কাজ করার সুবাদে নৃতাত্ত্বিক জনজীবনের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবয়বের বিভিন্ন নিয়ামক, ঘটনা, উপাখ্যান দেখা ও উপলব্ধির সুযোগ পেয়েছি।

বাংলাদেশের বাঙালি জনগণের তুলনায় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রণালি, ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন। মধুপুরের গারো পাহাড়ের সুলেখা বলেছিল, তাদের জীবন পাহাড়ের মতো রুক্ষ। মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরির নৈসর্গিক স্থান গোয়াইনঘাটের সংগ্রাম পুঞ্জির খাসিয়া লামিনদের জীবনে সুখ - সেতো লুকোচুরির খেলা, জীবনে তাদের মেঘের আনাগোনাই বেশি।

এ কম্পোনেন্টে কাজের মাঝে কিছু কুড়িয়ে পাওয়া সংলাপও যত্ন করে রাখার মতো। কুলাউড়ার সাদামাঠা বাবলি তালাং কি অদ্ভুতভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিল, 'Leaving no one behin' কাউকে পিছনে ফেলে রাখা যাবেনা। লামিনের বড় ইচ্ছে ছিল এ কম্পোনেন্টে ফ্যাসিলিটেটরের চাকরি নেয়া। লামিনের চাকরিটি হয়নি।

কম্পোনেন্টের আওতায় ছয়টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে কম্পোনেন্টের কিছু সদস্যকে সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যারা ঘরের বাহিরে যেতে চান না, তারা আজ ঘরে ছাড়া অনেক দূরে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সুশৃঙ্খলভাবে আবাসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত এপিডি, উপজেলা সমবায় অফিসার, ফ্যাসিলিটেটর ও অফিস সহকারীদের মধ্যে প্রকল্পে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ক্যাটাগরিভিত্তিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১০ জন পুরস্কারপ্রাপ্ত হন।

ঋণ ও সম্পদ সহায়তা সীমিত হলেও এ কম্পোনেন্টের তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য এ কম্পোনেন্ট। এসডিজি›র অন্যতম উদ্দেশ্য হল 'Leaving no one behind' কাউকে পিছনে ফেলে রাখা যাবে না। ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে চলেছে। সেই উন্নত বাংলাদেশে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীসহ অনগ্রসর সকল জনগোষ্ঠী উন্নত জীবনের অধিকারী হবেন। নৃতাত্ত্বিক জনগণ যখন জেনেছেন, এ কম্পোনেন্ট শুধু নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ- তখন তারা আবেগ আপ্লুত হয়েছেন। তারা প্রত্যাশা করেন তাদেরকে নিয়ে আগামী দিনেও বড় আকারে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

আমাদের বিশ্বাস আমরা নৃতাত্ত্বিক জনজীবনে এ কম্পোনেন্টের মাধ্যমে কিছুটা হলেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছি। আগামী দিনে আরও বড় প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে তারা উন্নত জীবনের অধিকারী হবেন নিশ্চয়।

মোঃ জিল্লুর রহমান : যুগ্ম নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

নারীর ক্ষমতায়নে আইজিএ প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা

প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ

মোহাঃ আব্দুল মজিদ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়বান্ধব নেতা ছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশকে পুনর্গঠিত করতে তিনি কেবল সমবায় পদ্ধতিকেই বেছে নিতে চেয়েছিলেন। দেশের সর্বোচ্চ আইন আমাদের পবিত্র সংবিধানেও সম্পদের মালিকানার একটি খাত হিসেবে সমবায়কে স্থান দিয়েছে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প গড়ে উঠবে, গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে (১৯৭০ সালে টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণ)। জাতির পিতার স্বপ্নে ছিল দক্ষ মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক আন্দোলন ত্বরান্বিত করা। আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ দৃঢ়চেতার সাথে করে যাচ্ছেন আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়চেতা নেতৃত্বে

দেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হলো নারী। দেশের উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে দেশের পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরকেও দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। গ্রামে গ্রামে আজও মেয়েরা অবহেলিত। তাদেরকে জাতীয় অর্থনৈতিক ধারায় যুক্ত করতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা মোকাবেলা করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এবং জাতির পিতার যে সোনার বাংলা স্বপ্ন আমরা দেখি, তা অধরাই রয়ে যাবে।

নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

যেহেতু দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী, তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। ১৯৭২ সালেই জাতির পিতার নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীদের সমান সুযোগের কথা বলা হয়েছে (ধারা ২৮)। ১৯৭২ সালের সংবিধানে অন্য অনেক জায়গায় নারীদের ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে। জাতির পিতা বলেছিলেন, 'নারীদেরও পুরুষদের মতো সমান অধিকার রয়েছে এবং তা রাজনীতির ক্ষেত্রেও। আওয়ামী লীগ যেমন অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করে, তেমনি নর-নারীর সমান অধিকারেও বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগেও নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা দরকার।' বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসের ভাষণে নারী সমবায়ীদের এগিয়ে আসার কথা বলেছেন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য করে বাংলাদেশ সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) গ্রহণ করেছে, যার মূল স্লোগান হলো 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়'। নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে এবার গ্রামীণ অর্থনীতি ও নারীর ক্ষমতায়নে দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনায় দেশে মোট ৮১ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং নারীর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-'৪১, ২০১৮ সালের সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে শক্তিশালী করা জরুরি, না হলে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লিখিত অংশগ্রহণমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে দেশের নানা দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সমবায় অধিদপ্তর এর অধীনস্থ ১টি একাডেমি ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। নওগাঁ আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট এরকম একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সঠিক ও আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী না পাওয়া গেলে এইসকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনেকসময়ই ফলপ্রসূ হয় না।

মহিলাদের আইজিএ প্রশিক্ষণের বর্তমান পদ্ধতি এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁয় নারীদের জন্যে কিছু দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে যেমন- ব্লক-বাটিক, ক্রিস্টাল শোপিস, টেইলারিং ও দর্জিবিদ্যা, বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ মূল উদ্দেশ্য হলো মেয়েদেরকে এরূপ প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে কর্মক্ষম জনসম্পদে পরিণত করা, যা পরিবারের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তায় এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখতে পারছে। নারীদের জন্যে বিশেষভাবে উপযোগী এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরোক্ষভাবে নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু যদি সঠিক ও আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী না পাওয়া যায়, তাহলে এই প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হয় না। এছাড়া, প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে কোনো আর্থিক সহযোগিতা সমবায় অধিদপ্তর থেকে করা হয় না। ফলে, ট্রেনিং শেষ করেও অনেকেই মূলধনের অভাবে অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করে নিজের আর্থ- সামাজিক অবস্থা সুরক্ষা করতে পারছে না। অন্যদিকে, মেয়েদের কাছে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের হাতে খড়ি নিতে দূরে কোনো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যেতে সামাজিক বাধার সম্মুখীন হয়। এই প্রতিবন্ধকতাকে মাথায় রেখে সমবায় অধিদপ্তর ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে অনাবাসিক আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। অধিকতর এবং আবাসিক প্রশিক্ষণের নিমিত্তে আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট নিরলসভাবে কাজে করে যাচ্ছে। মোটা দাগে, মহিলাদের আইজিএ প্রশিক্ষণের বর্তমান পদ্ধতিতে এবং প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত চ্যালেঞ্জসমূহ

লক্ষ করা যায়-

- প্রশিক্ষণপরবর্তী মূলধন ও উপকরণ সেবা পাওয়া যায় না।
- দক্ষতা উন্নয়নের প্রাথমিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র নিকটবর্তী না হওয়া।
- সঠিক ও আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী না পাওয়া।

মহিলাদের আইজিএ প্রশিক্ষণের চ্যালেঞ্জ দূরীকরণে গৃহীত উদ্যোগ

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণে বা অন্য কোনো আইজিএ প্রশিক্ষণ শেষে প্রায়ই আমাদেরকে শুনতে হয়, এ ধরনের প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করে নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে দরকার আর্থিক সহযোগিতা। দরকার উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধন। দরকার প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ উপকরণ। অথচ সমবায় অধিদপ্তর থেকে মূলধন কিংবা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রদান করা হয় না। আবার, উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক চুক্তির অভাবে সমবায় অধিদপ্তর অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমবায়ীকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা করতে পারে না। ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেও সমবায়ীরা প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাব সবসময়ই মনের মধ্যে পুষে রাখতেন এবং যখনই কোন ঊর্ধ্বতন সমবায় কর্মকর্তাকে কাছে পেতেন, তারা তাদের এই অসহায়ত্বের কথা বলতেন। বিষয়টি আমাদের ভিতরে একটি আলোড়ন তৈরি করে। বারবার একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি দেয়, আমরা তো সমবায়ের মতো আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ও পরিচর্যা করি। তাহলে, আমাদের অত্বাবধানে থাকে সমবায় সমিতি তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থাকতে আমরা সমবায়ীদের এই অসহায় আকুতি কেন ঘোচাতে পারছি না! প্রশিক্ষণ শেষে সমবায়ীরা কেন আর্থিক নিশ্চয়তা পাচ্ছে না, অথচ সে কোনো না কোনো সমবায় সমিতির সদস্য! কেন তারা সমবায় কর্মকর্তাদের নিকট অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের কথা উত্থাপন করেন! সমবায়ীরা প্রায়ই এ প্রসঙ্গে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কথা উত্থাপন করে বলেন, প্রশিক্ষণ শেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক) হতে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্যাটালিস্ট এর ভূমিকা পালন করে। কেন সমবায় অধিদপ্তর এই ধরনের ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে! অথচ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের চেয়ে সমবায় সমিতি হয়ে ঋণ গ্রহণ করা অধিকতর সহজতর। বিষয়গুলো ভাবনার খোরাক জোগায়। এমন সময় মনে হলো, সমবায়ীদেরকে প্রশিক্ষণ শেষে মূলধন ও প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রদান করার ক্ষেত্রে সমবায় অর্থায়নকে কি সহজেই গ্রহণ করা যায় না? কীভাবে?

এখানে, সমবায় অধিদপ্তর স্থানীয় ভাবে আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। যেখানে যে সকল সমবায় সমিতির সদস্যরা আইজিএ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে, তারা তাদের সমবায় সমিতিগুলোতে প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করে এবং গৃহীত প্রকল্প উপস্থাপন করে প্রয়োজনীয় মূলধন স্বল্প সরল মুনাফায় ঋণ হিসেবে পাবে। এখানে মুনাফার হার সর্বোচ্চ ৫% হতে পারে। নারী উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে আরো কম হতে পারে। আর পুরা বিষয়টি তিন পাক্ষিক সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে মনিটরিং করবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা সমবায় কর্মকর্তা। পক্ষ হবে- ক) ঋণগ্রহীতা সমবায়ী, খ) সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি এবং গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ জেলা সমবায় কর্মকর্তা। স্থানীয় আইজিএ প্রশিক্ষণে যারা মেধার স্বাক্ষর রাখে এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহী হবে, তাদেরকে আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করা যায়। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটগুলোর আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা কম (বার্ষিকভাবে প্রায় ৭০০-৮০০ জনের মতো)। এই মডেলটি বাস্তবায়িত হলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটগুলো সঠিক ও আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী খুঁজে পাবে এবং সরকারি অর্থের ফলপ্রসূ ব্যবহার হবে। এই পদ্ধতির আমরা একটা নাম দিতে পারি- Capital Formation though Cooperative Financing (CFCF).

CFCF মডেলের বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা

বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক তার আওতাধীন ৮টি জেলার প্রতিটি জেলায় মোট ১০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে CFCF মডেলের আওতায় প্রশিক্ষণ উপকরণ ও মূলধন প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের উদ্যোগে CFCF মডেলের প্রথম বাস্তবায়ন হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলায়। সেখানে ২৫ জন নারী সমবায়ী টেইলারিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এই প্রশিক্ষণের শুরুতেই তারা ঋণ হিসেবে সেলাইমেশিন পেয়েছেন এবং তাদের নিজেদের সেলাই মেশিনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। CFCF মডেলের আওতায় এখানে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং সে অনুযায়ী নারী সমবায়ীগণ স্বল্প সরল মুনাফায় নিজ নিজ সমবায় সমিতি হতে ঋণ সুবিধা পাবেন। নিঃসন্দেহে এই উদ্যোগ নারী সমবায়ীগণের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে তারা যে মূলধন ও প্রশিক্ষণ উপকরণের অভাব অনুভব করতেন, তা সমধান করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রশিক্ষণ শেষেই তারা পরিবারে আর্থিক অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে, যা নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক, জেলা সমবায় কর্মকর্তাগণ ও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০০ জন নারী সমবায়ী এরূপ আইজিএ প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং একইসঙ্গে প্রশিক্ষণ উপকরণ ও স্বল্প মুনাফায় ঋণ সুবিধা পেয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে, এদের মধ্য থেকে আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে উচ্চতর আবাসিক প্রশিক্ষণের জন্যে নির্বাচিত করা হচ্ছে। এখানে প্রশিক্ষণ চলাকালীন তাদের সাথে কথা বলে বুঝা যাচ্ছে, তারা আগ্রহী ও মনোযোগী। অর্থাৎ প্রশিক্ষণার্থীর মানও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আর প্রশিক্ষণার্থীর মান বৃদ্ধি পেলে প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং সরকারি অর্থের সঠিক ও ফলপ্রসূ ব্যবহার হয়। পরোক্ষভাবে, এরূপ মডেল নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে।

শেষ কথা

'এ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর'।

নারীরা অমিত শক্তির অধিকারী। আজ আমরা নিম্ন আয়ের দেশের সীমানা পেড়িয়ে উন্নয়নের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছি। দেশের অর্ধেক এই মেধা ও শক্তিকে কাজে না লাগাতে পারলে আমাদের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হবে। বাংলাদেশ সরকার পরিষ্কারভাবে নারীর ক্ষমতায়নের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এক্ষেত্রে সরকার 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' নীতি অবলম্বন করছে। এ বছর সমাজে গঠনে নারী নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিয়ে নারী দিবস পালিত হয়েছে। সেই সংগতকারণেই আমাদের কর্মকাণ্ডে 'নারীর ক্ষমতায়ন'কে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। নারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, যাতে আরো বেশি নারী নেতৃত্ব তৈরি হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ প্রচেষ্টায় CFCF মডেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মোহাঃ আব্দুল মজিদ: যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী

প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নই হতে পারে সোনার বাংলা গড়ার প্রধান হাতিয়ার

মোঃ জিয়াউল হক

মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য উপাদান। মানব সম্পদ ছাড়া উন্নয়নের অন্যান্য উপাদান অর্থহীন হয়ে পড়ে। মানব সম্পদ এক সীমাহীন সম্ভাবনাময় ক্ষমতার সমাহার। মানব সম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development) মূলত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resource Management) এর অংশ। সাধারণতঃ কর্মক্ষম মানুষের দক্ষতা, জ্ঞান এবং সক্ষমতার উন্নয়ন সাধন করাই মানব সম্পদ উন্নয়ন। এটি জনসম্পদের এমন একটি গুণগত পরিবর্তন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তারা উৎপাদনক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে এবং মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের সর্বোত্তম বিকাশে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মানব সত্তাকে মূল্যবান করে তোলে এবং তাদের উন্নয়ন সাধন করে তোলে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হলে একটি স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ সোনার বাংলা গঠন সম্ভব হবে।

সোনার বাংলা গঠনে সোনার মানুষ চাই

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনদর্শন ছিল এদেশের গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মানবিক সংগ্রামী দর্শন। যা ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন, দুর্নীতি-শোষণ, বঞ্চনা-দুর্দশামুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এমন একটি বাংলাদেশ যেখানে জন্মসূত্রে কেউ দারিদ্র থাকবে না, যে বাংলাদেশি মানুষের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী। যে বাংলাদেশ হবে বঞ্চনামুক্ত, সমতাভিত্তিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এককথায় সোনার বাংলা।

ব্রিটিশ হাউজ অব লর্ডসের সদস্য ফেনার ব্রকওয়ে বলেছিলেন, ‘‘শেখ মুজিব শুধু তার জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেননি তিনি তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।’’

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুস্থ-সবল, জ্ঞান চেতনাসমৃদ্ধ দেশ গঠনের জন্য প্রয়োজন দক্ষ, প্রশিক্ষিত, কর্মঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ জনশক্তির। যারা সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করবে। আর প্রশিক্ষণই অদক্ষ ও অজ্ঞ মানুষকে কর্মক্ষম করে তোলে এবং সচেতন করে তোলে।

প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়নের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও কার্যকর হাতিয়ার। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ আধুনিক প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে মানব সম্পদকে অধিকতর দক্ষ ও উৎপাদনশীল করা যায়। সাধারণ জনগণ প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে পরিণত হয় জনসম্পদে। প্রশিক্ষণ মানব সম্পদ উন্নয়নে নিম্নোক্তভাবে ভূমিকা রাখে।

আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে প্রশিক্ষণ: বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ যেমন-ইলেকট্রিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণ, গাভি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, মাছ চাষ, মাশরুম চাষ, মৌচাষ, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ ইত্যাদি ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান জনসাধারণের আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ: আমরা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন চাই। আধুনিক পুঁজিবাদী ও ভোগবাদি সমাজে ব্যক্তি স্বার্থ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কিন্তু টেকসই উন্নয়ন বলতে শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নয় সামাজিক উন্নয়নকে বুঝায়। সমাজে একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করা, হৃদ্যতা ভালোবাসা বৃদ্ধি ও সমাজ সচেতনতায় প্রশিক্ষণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ: সরকারের বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কাজের গুণগত মান বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সোনার বাংলা গঠনে SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

২০১৫ সালে ১৯৩টি দেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal)-র ক্ষেত্রে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে একমত হয়েছে যা মূলত একটি দেশের উন্নয়ন শুধু নয় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। SDG এর ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে: ১। দারিদ্র্য বিমোচন, ২। ক্ষুধা মুক্তি, ৩। সুস্বাস্থ্য, ৪। মানসম্মত শিক্ষা, ৫। লিঙ্গ সমতা, ৬। সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাষন ব্যবস্থা, ৭। নবায়ন যোগ্য জ্বালানি, ৮। কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি, ৯। উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, ১০। বৈষম্য হ্রাস, ১১। টেকসই নগর ও সম্প্রদায়, ১২। সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার, ১৩। জলবায়ু বিষয়ক পদক্ষেপ, ১৪। টেকসই মহানগর ১৫। ভূমির টেকসই ব্যবহার, ১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান, ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশিদারিত্ব ইত্যাদি বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন মূলত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের নামান্তর।

SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সমবায় প্রশিক্ষণ

সমবায় আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে ১৯১৫ সালে ম্যাকগ্লাকন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৬ সালে অবিভক্ত বাংলার দমদমে The Bangle Cooperative Training Institute স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিসহ ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সমবায় সমতির সদস্যদের সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি ও সমিতির সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক (ইলেকট্রিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণ, গাভি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, মাছ চাষ, মাশরুম চাষ, মৌচাষ, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ) ইত্যাদি বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

জাতীয় সমবায় নীতি ২০১২ এর ভিশনে বলা হয়েছে ‘‘আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে সমবায়কে লাগসই মানবিক উদ্যোগ হিসেবে সফল করে তোলা।’’

তাই বলা যায়, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা SDG এর ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশই মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত, যা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। সমবায়ের অন্যতম ভিশন যেহেতু আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন তাই সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অনেকাংশে অর্জন করা সম্ভব। যেমন- সমিতির মহিলা সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি যা SDG এর ৫ নং লক্ষ্য পূরণে সহায়ক। সমবায় সমিতির সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে SDG এর ৮নং লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে। প্রান্তিক মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি SDG এর ১ ও ২ নং লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে। শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরির নিমিত্তে সমাজে সমতা বিধানের লক্ষ্যে জবাবদিহিমূলক সমবায় সমিতি গঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ SDG এর ১৬ নং লক্ষ্য পূরণে সহায়ক। মোটকথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে, যা সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মানদণ্ডে আমরা বলতে পারি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নই হতে পারে সোনার বাংলা গড়ার প্রধান হাতিয়ার।

মোঃ জিয়াউল হক : উপাধ্যক্ষ (যুগ্ম নিবন্ধক), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

আন্তর্জাতিক সমবায় জোট

এম এম মোর্শেদ

বিশ্বব্যাপী সমবায় ফেডারেশন বা ইউনিয়নকে একত্রীভূত করে সমবায় আন্দোলনকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৯ আগস্ট ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক সমবায় জোট (International Cooperative Alliance- ICA)। এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল লন্ডন শহরে- আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, জার্মানি, পোল্যান্ড, ভারত, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, সার্বিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমবায় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে। আইসিএ পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ বেসরকারি সংস্থা (NGO)। আইসিএ ১ বিলিয়ন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে এবং ৩ মিলিয়ন মানুষ সমবায়ের সাথে কাজ করছে। আইসিএ বিশ্বের ১১২টি দেশে ৩১৮টি সমবায় সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। সারা বিশ্বে ২৮০ মিলিয়ন ব্যক্তির জন্য চাকরি বা কাজের সুযোগ প্রদান করে।

বেলজিয়ামের ব্রাসেলস এ অবস্থিত সদরদপ্তর ছাড়া আইসিএ এর রয়েছে চারটি আঞ্চলিক কার্যালয়।

- আফ্রিকা
- আমেরিকা

আইসিএ এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট Mr. Ariel Guarco

- এশিয়া প্যাসিফিক
- ইউরোপ

আইসিএ এর অঙ্গ সংগঠন

- আন্তর্জাতিক কৃষি সমবায় সংস্থা (ICAO)
- বিশ্বব্যাপী ভোক্তা সমবায় (CCW)
- আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সমবায় সংস্থা (IHCO)
- আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সমবায় সংঘ (ICBA)
- আন্তর্জাতিক মৎস্য সমবায় সংস্থা (ICFO)
- আন্তর্জাতিক আবাসন সমবায় (CHI)
- আন্তর্জাতিক সমবায় পারস্পরিক ও বিমা ফেডারেশন (ICMIF)

আইসিএ প্রদত্ত সমবায়ের সংজ্ঞা

A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise.

আইসিএ এর সাতটি মূলনীতি

- স্বেচ্ছাসেবী ও উন্মুক্ত সদস্য (Voluntary and Open Membership)
- গণতান্ত্রিক সদস্য নিয়ন্ত্রণ (Democratic Member Control)
- সদস্যদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ (Member Economic Participation)
- স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা (Autonomy and Independent)
- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং তথ্য (Education, Training, and Information)
- সমবায়ীদের মধ্যে সহযোগিতা (Cooperation among Cooperatives)
- সমাজের প্রতি সচেতন (Concern for Community)

সমবায়ের মূল্যবোধ

- স্বাবলম্বন (Self Help)
- স্ব-দায়িত্ব (Self Responsibility)
- গণতান্ত্রিক (Democracy)
- সমতা (Equality)
- ন্যায়পরায়নতা (Equity)
- সংহতি (Solidarity)

আইসিএ এর পতাকা

অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার ন্যায় আইসিএ এরও রয়েছে নিজস্ব পতাকা। সমবায় পতাকার রূপকার ছিলেন ফরাসি বিখ্যাত দার্শনিক ও সমবায় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক চার্লস ফুরিরের গাইড। প্রথম তিনি সমবায় পতাকার সুপারিশ করেন ১৮৬৯ খ্রি. অনুষ্ঠিত আইসিএ কংগ্রেসের মাধ্যমে। ১৯২০ খ্রি. অনুষ্ঠিত আইসিএ কংগ্রেসের মাধ্যমে পতাকাটি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯২৪ খ্রি. অনুষ্ঠিত আইসিএ কংগ্রেসে সর্বপ্রথম সমবায় পতাকাটি উত্তোলন করা হয়। তখন পতাকাটি ছিল ৭ রঙের ডোরা কাটা। বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল।

তবে কালের পরিবর্তনে সমবায় পতাকার ডিজাইন ও রং পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সমবায় পতাকা পাম (Plum) যা দেখতে অনেকটা গাঢ় বেগুনি রঙের মতো রং এর পটভূমিতে সাদা রংয়ের COOP লেখা। পাম রংটি মূলত আইসিএ এর জন্য সংরক্ষিত। পাম (পেটন নং ২৮৮) ছাড়া আরো ৬টি রংকে আইসিএ অনুমোদন করেছে। রংগুলো হল লাল (পেটন নং-১৮৫), কমলা (পেটন নং-১৫১), নীল (পেটন নং-২৭২৬), ফিরোজা (পেটন নং-৬৩২), সবুজ (পেটন নং-৩৪০), ও হালকা সবুজ (পেটন নং-৩৭৬)। এ ৬টি রং থেকে যেকোনোটি কোনো দেশের সমবায় ব্যবহার করতে পারবে। তবে প্রতিটি রং এর পতাকার মাঝখানে খচিত COOP লেখাটি সাদা রং হতে হবে। লেখার ডিজাইনটি একই রকম হতে হবে। মূলত সাদা খচিত COOP লেখাটিই সমবায়ের নতুন লোগো। COOP লোগো পতাকার ডিজাইন ব্যবহার করার পূর্বে global@identity.coop থেকে অনুমোদন নিতে হবে। সমবায়ের নতুন এই পতাকার ডিজাইন তৈরি করেছে ব্রিটিশ কোঅপারেটিভ Calverts। ২০১৩ খ্রি. দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে অনুষ্ঠিত আইসিএ কংগ্রেসে এই লোগো ও পতাকাটি উদ্বোধন করা হয়।

সমবায়ের নতুন এই পতাকা ও লোগোটি সমবায়ের জন্য এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। কেননা COOP মানে সমবায় (Cooperative) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যা বহুকাল থেকেই সারা বিশ্বে সমবায়ীদের কাছে অতি জনপ্রিয় একটি নাম। এই নতুন COOP লোগো ও পতাকা সম্বন্ধে তৎকালীন আইসিএ প্রেসিডেন্ট Dame Paulien Green বলেন, This new brand or identifier that we produced is something that we believe there is a real trust for around the world and has been for some time. When we had the UN logo everybody around the world used it.

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস হলো সমবায় আন্দোলনের একটি বার্ষিক উদযাপন যা ১৯২৩ খ্রি. থেকে আইসিএ জুলাই মাসের প্রথম শনিবার পালন করে আসছে। ১৯৯২ খ্রি. ১৬ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ Resolution- ৪৭/৯০ এর মাধ্যমে ঘোষনা করে, আইসিএ প্রতিষ্ঠার শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৯৫ খ্রি. থেকে জুলাই মাসের প্রথম শনিবার আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস। ১৯৯৫ খ্রি. থেকে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসের পাশাপাশি যৌথভাবে পালন করে আসছে।

সারাবিশ্বের সমবায়গুলো বিভিন্নভাবে আন্তজার্তিক সমবায় দিবস পালন করে থাকে। প্রতিবছর COPAC আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে থাকে। ২০২১ খ্রি. আন্তর্জাতিক সমবায়

দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে Re Build Better Together।

১২, জুলাই ২০২১ খ্রি. COPAC এবং জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যে একটি অনলাইন আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল দুইটি।

কীভাবে সমবায় জনকেন্দ্রিক ও পরিবেশগতভাবে পুনরুদ্ধার করতে পারে।

COPAC সদস্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং তৃণমূল পর্যায়ের সমবায় বিশেষজ্ঞরা কীভাবে কাজ করতে পারে তা নিয়ে অনুসন্ধান করা।

ইউরোপিয়ান কমিশনের হেড অব ইউনিট মিস Marlene Holzner সমবায়ের সহনশীলতা, স্থিতি স্থাপন এবং সন্তোষজনক কাজের জন্য বিশেষ করে বৈষম্য কমাতে সমবায়ের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন আন্তর্জাতিক সমবায় উন্নয়নে “আইসিএ-ইইউ” যৌথভাবে “#coops8dev” এর মাধ্যমে সমবায়কে শক্তিশালী ও উন্নীত করার জন্য কমিশনের প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করেছে যে এটি টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

নোট : COPAC- UN Committee for the Promotion and Advancement of Cooperative.

আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১২ খ্রি. কে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষনা করে। তারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের অবদান, বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক সংহতির উপর তাদের প্রভাব তুলে ধরেছে। “সমবায়ের উদ্যোগ একটি উন্নততর বিশ্ব গড়ে তুলে” (Cooperative enterprise build a better world) এই প্রতিপাদ্যের সাথে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষের ৩টি প্রধান উদ্দেশ্য :

- সচেতনতা বৃদ্ধি (Increase awareness)
- উন্নয়ন বিকাশে সহায়তা (Promote growth)
- উপযুক্ত নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা (Establish appropriate policies)

আইসিএ এর কার্যক্রম

নিম্ন ও মধ্য নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে সমবায় আন্দোলনকে ক্ষমতায়নের জন্য আইসিএ নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে ঃ

বিভিন্ন দেশের সমবায় আইন পর্যালোচনা করে সময় উপযোগী বিশেষ করে পরিবেশ উন্নত করার পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

বিভিন্ন দেশের সমবায় আন্দোলন বিশ্লেষন করে যেমন কর্মচারী, সদস্য এবং উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে সঠিক ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এছাড়াও বিভিন্ন সেক্টর ও উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

সমবায় উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ বিশেষ করে অনলাইন ডাটাবেসের মাধ্যমে সমবায় উদ্যোক্তাকে সহায়তা করে থাকে।

বিশ্বব্যাপী সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য “কুপএকাডেমি” ও “গ্লোবাল ইয়ুথ ফোরাম” এর মতো কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

সমবায় ও অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক প্রকাশনার মাধ্যমে তরুণদের সম্পৃক্ততা নিয়ে গবেষণা করে থাকে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সফল সমবায়গুলোর অনুপ্রেরণামূলক ভিডিও ও ডকুমেন্টারি প্রচার করে থাকে।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় আইসিএ এর পদক্ষেপ

বিশ্ব কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আইসিএ অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন-

সমবায়ীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য বিশেষ করে মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বাস্থ্যবিধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক ভিডিও প্রচার, বিশেষ করে ‘Coops Day’ উদ্‌যাপন উল্লেখযোগ্য।

কুপ ইউরোপ (Coop Europe) কর্তৃক সমগ্র ইউরোপের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট নিরসনের জন্য জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ এবং সংকট মোকাবিলার জন্য সুপারিশ প্রদান।

সুপারিশ সমূহ

- নীতি প্রণয়নকারীদের সক্রিয়ভাবে নীতি পণয়নে সমবায় সংস্থাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য যাতে তারা তাদের প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া।
- ডিজিটাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, বিশেষ করে তথ্য বা অর্থায়নের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান, প্রয়োজনবোধে ডিজিটাল প্রসেস স্থাপনের মাধ্যমে অনলাইনে কাজ করার সুযোগ তৈরি করা।
- পরিবেশবান্ধব ও অনলাইনে পণ্য প্রদান সেবা।
- জাতীয় পর্যায়ে সরকার/কর্তৃপক্ষের উচিত দেশের শীর্ষস্থানীয় সমবায়ের সাথে সমন্বয় করে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করা।
- বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য প্রতিনিধিত্ব মূলক সংগঠনসমূহকে এগিয়ে আসা উচিত।
- সরকার/কর্তৃপক্ষের উচিৎ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের তথ্য প্রবেশের অনুমতি প্রদানে সহযোগিতা করা। বিশেষ করে সমবায় সংক্রান্ত কার্যক্রম ভালোভাবে বুঝতে সহযোগিতা করা। কিছু নির্দিষ্ট সমবায় সেক্টর (পর্যটন, সংস্কৃতি) কে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা।

কোভিড-১৯ সংকট নিরসনে নারী নেতৃত্বের ভূমিকা

নারীরা কোভিড-১৯ সংকট উত্তরণে প্রথম সারিতে কাজ করছে। যেমন-স্বাস্থ কর্মী, কেয়ার গিভারস (Care givers), উদ্ভাবক, সমাজ সংগঠক (Community Organizer) অতিমারি মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ প্রতিক্রিয়া

এবং পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় (Response and recovery) কার্যকরভাবে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য নারী নেতৃবৃন্দ এবং নারী সংগঠনসমূহ তাদের দক্ষতা, জ্ঞান এবং নেটওয়ার্ক প্রদর্শন এর মাধ্যমে প্রশংসিত হয়েছে।

আইসিএ এর জেন্ডার সমতা কমিটির প্রকাশনার তথ্যমতে আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া প্যাসিফিক ও ইউরোপ এর বেশ কয়েকটি নারী সমবায়ী কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় বিশেষ করে প্রতিক্রিয়া ও পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় (Response and recovery) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কুপ ইউকে

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কুপ ইউকে গৃহহীনদের সহায়তার জন্য এগিয়ে আসে। তাছাড়া অপরিহার্য কর্মচারীদের কাজ করার সময় বোনাস, বিনামূল্যে দুপুরের খাবার, চাইল্ড কেয়ার সেবায় ছাড় (ডিসকাউন্ট) দেয়া ও খাবার পরিবেশন করা হয়।

কুপ বুলগেরিয়া ও কুপ ইতালি

কুপ বুলগেরিয়া ও কুপ ইতালি ইউরোপে সরবরাহে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পণ্য সরবারাহে তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখে; বুলগেরিয়ার সমবায় জীবানুনাশক সরবরাহ করে। স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোকে সহায়তা করার জন্য "কুপ কেয়ার প্ল্যাটফর্ম" ও স্থাপন করা হয়েছে।

রাশিয়া

সমবায় বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী এবং প্রত্যন্ত ও গ্রামাঞ্চলে যারা স্ব-বিছিন্নতায় (Isolation) বাস করে তাদের কাছে মৌলিক পণ্য ও ঔষধ সরবরাহ করে।

স্পেন

স্প্যানিশ সমবায় মেডিকেল সেক্টরের জন্য ১০ মিলিয়ন মাস্ক এবং শ্বাসযন্ত্রের মেশিন (মন্ড্রাগন অ্যাসেম্বলি এবং বেক্সেন মেডিকেল) তৈরিতে সহযোগিতা করে।

সুইডেন

বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য কর্মের অর্থায়নের জন্য সুইডেনে সমবায় বিনিয়োগকারীরা নতুন বন্ডে ২৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে (Folksam Group)

আইসিএ এর সদস্য পদলাভের যোগ্যতা

আইসিএ এর দুই ধরনের সদস্য পদ রয়েছে।

১. পূর্ণ সদস্য (Full Members) :

ক) জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন/ফেডারেশন

খ) সমবায় ইউনিয়নের জাতীয় কনফেডারেশন (শীর্ষ সমবায়)

গ) জাতীয় সমবায় ব্যবসা সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বতন্ত্র মালিকানা (জাতীয় পর্যায়ে কাজ করে এমন একটি সমবায় সমিতি যার সদস্যরা কেবল মানুষ নয় বরং এন্টারপ্রাইজও হতে পারে)।

ঘ) স্বতন্ত্র সমবায় সংস্থা (প্রাথমিক বা তৃণমূল সমবায়)

ঙ) আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক (সুপার ন্যশনাল) ফেডারেশন বা সমবায় সংগঠনের ইউনিয়ন (একাধিক দেশের সংগঠন)

চ) পারস্পরিক সংগঠন বা সমবায় পরিচয়ের ওপর আইসিএ এর বিবৃতি মেনে চলে।

২. সহযোগী সদস্য : (Associate Members)

ক) যেসব সংগঠন সমবায়ের সমর্থক

খ) সরকারি বিভাগ/সংস্থা

গ) সমবায় দ্বারা মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলো (স্বত্বাধিকারী যারা নিজেরা সমবায় নয়, আবার সম্পূর্ণভাবে সমবায় দ্বারা মালিকানাধীন ব্যক্তি নয়)।

ঘ) শিক্ষা, গবেষণা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যা সমবায় এবং সমবায় আন্দোলনের প্রচার বা অর্থায়ন করে (প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যাদের কোন সমবায় সদস্য নেই)

ঙ) পূর্ণ সদস্যের অধিকারী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তারা পূর্ণ সদস্য পদের জন্য আবেদন করার জন্য প্রস্তুত নয় (সীমিত সময়ের জন্য)।

সদস্যপদের জন্য অবশ্যই প্রার্থীকে নিম্নোক্ত দলিল/তথ্যাবলি আইসিএ "Membership Application From" পূরণ করে hacquard@ica.coop এ ইমেইলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

সংস্থার বিধি, উপ-বিধি ও মর্যাদা
সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন
সমিতির সদস্যের তালিকা
সাংগঠনিক সংশ্লিষ্টতার তালিকা

আইসিএ সদস্য পদের সুবিধা

বৈশ্বিক নেটওয়ারর্কিং (Global Networking) :

আইসিএ এর সদস্য হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন সেক্টর ও বৃহৎ সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ করা, তাদের সাথে মতবিনিময় এবং আইডিয়া শেয়ার করার সুযোগ।

বিশ্বসেরা অনুশীলন (Global best Practice) :

সমবায় শাসন, তহবিল এবং বিপণন ইত্যাদি বিশ্বব্যাপী সর্বশেষ (Updated) সেরা অনুশীলনগুলো চর্চার মাধ্যমে সমবায় সংস্থার কর্মদক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ।

বৈশ্বিক প্রতিনিধিত্ব (Global representation) :

ব্যবসায়িক খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সমবায় আন্দোলনে জাতিসংঘ, জি-২০ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ।

বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Global decision making) :

আন্তর্জাতিক সমবায় আন্দোলনের কৌশল সম্পর্কিত বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ।

আমরা আশা করবো বাংলাদেশের বৃহৎ সমবায়গুলো আইসিএ এর সদস্য পদ লাভ করে বৈশ্বিক প্রতিনিধিত্ব প্রদান ও বৈশ্বিক নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে আমাদের সমবায় আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে এবং একই সাথে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

এম এম মোর্শেদ : সিনিয়র কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার, ইন্টারটেক বাংলাদেশ, সাবেক কিউইডি কো-অর্ডিনেটর ইন্টারকুপ (Intercoop)- বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান

কৃতজ্ঞতা স্বীকারে (Acknowledgement)

Marc Noel, Director of International Development, ICA HQ

Leire Luengo, Director of Communications, ICA HQ

Ines Segui, ICA Communications Officer, ICA HQ

Sarah Howard, Wild Thang Limited, UK.

Sion Whellens, Calverts, UK.

প্রশাসনিক ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ

প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী আবশ্যক। প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের মেধা ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে নিজে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি দেশকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। একটি জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হলে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। প্রশিক্ষণই পারে তাদেরকে দক্ষতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে দিতে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও অধীনস্থ দশটি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট থেকে সমবায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইজিএ ও সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া সমবায় বিভাগের অধীনস্থ কর্মচারীদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমবায়ী ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও উদ্ভাবনী

ক্র : নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী	কোর্সের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		
					পুরুষ	মহিলা	মোট
১	সমবায় অডিটিং	০২	সহকারী পরিদর্শক ও সমমান	১০	৩৮	১২	৫০
২	আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা	০৩	সহকারী পরিদর্শক/অফিস সহকারী	৫	৬৬	৯	৭৫
৩	হিসাব সংরক্ষণ	০৫	সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ	৫	১২৫	-	১২৫
৪	সমবায় ব্যবস্থাপনা	০৪	ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ	৫	৭৫	২৫	১০০
৫	আইজিএ কম্পিউটার	০২	সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ	১০	৫০	-	৫০
৬	আইজিএ টেইলারিং	০২	সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ	১০	-	৫০	৫০
৭	আইজিএ প্লাম্বিং	০২	সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ	৫	৫০	-	৫০
৮	আইজিএ ব্লক-বাটিক	০৫	সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ	৫	-	১২৫	১২৫
৯	আইজিএ মোবাইল সার্ভিসিং	০২	সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ	৫	৫০	-	৫০
১০	আইজিএ ইলেকট্রিক্যাল	০২	সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ	৫	৫০	-	৫০
১১	আমার বাড়ি আমার খামার	২১	উপকারভোগী সদস্যবৃন্দ	৩	৪৮৭	৩৫৩	৮৪০
১২	ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক	০৬	উপকারভোগী সদস্যবৃন্দ	৩/৫	১২৯	৫১	১৮০
	মোট	৫৬			১১২০	৬২৫	১৭৪৫

প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করাই আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁর মূল

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. প্রশিক্ষণার্থীগণকে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানব সম্পদ গঠন।
২. সৃজনশীল ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।
৩. সমবায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষ সেবক হিসেবে গড়ে তোলা।

চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগা রাজশাহী বিভাগের আওতাভুক্ত ৭টি জেলার বিভাগীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি সমবায়ীগণের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০২০-'২১ অর্থবছরের পরিসংখ্যান থেকে এ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ধারণা পাওয়া যায়।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুবিধা বৃদ্ধি/ আধুনিকায়ন

প্রশিক্ষণপ্রদান, গবেষণা ও সেমিনার-কর্মশালা আয়োজন আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের নিয়মিত কার্যক্রম। সংগতকারণে, আমাদের সেবাপ্রার্থী মূলত সমবায়ীবৃন্দ এবং বিভাগীয় কর্মচারীবৃন্দ। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যে দুর্বলতাসমূহ ছিল, তা দূর করার সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধরনের কার্যক্রমসমূহকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি-

ক) **প্রশিক্ষণের গুণগত মান উন্নয়ন :** সঠিক প্রশিক্ষণার্থী পাওয়া সবসময়ের জন্যেই একটি দুরূহ কাজ ছিল। সঠিক ব্যক্তি যেন তার প্রয়োজনীয় আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পেয়ে আত্মকর্মশীল হয়ে দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণে অবদান রাখতে পারে, তার জন্যে সঠিক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সঠিক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের স্তর থেকে সমবায়ীদের চাহিদামাফিক প্রশিক্ষণের (Need Based Training) উপায় বের করা হয়েছে এবং চাহিদামাফিক প্রশিক্ষণের তথ্য অনলাইনে প্রেরণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ডাটাবেইজ (2T model) তৈরি করা হয়েছে।

খ) **প্রশিক্ষণের কাঠামোগত মান উন্নয়ন :** কার্যকর প্রশিক্ষণের জন্যে চাই মনোমুগ্ধকর পরিবেশ এবং উন্নত অবকাঠামো। এর জন্যে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সকল প্রশিক্ষণার্থীদের কাজ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী হোস্টেল ও ক্যাম্পাসের উন্নয়নের জন্যে নিরলস চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত নিয়ে হোস্টেল ভবনে পর্দা, আয়না, ডাস্টবিন, পরিচ্ছন্ন টয়লেট, ক্যাম্পাসের লামফলক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুর‌্যাল চিত্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে অন্তত ১০ দিন পূর্বে নোটিশ প্রেরণ, SMS প্রেরণ করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানাতে অভ্যর্থনা কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। আসই, নওগাঁর সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

গ) **প্রশিক্ষণ সহায়ক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃজন :** অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে, আগত সকল প্রশিক্ষণার্থীর মতামত নিয়ে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পাসে সবুজের সমারোহ সৃষ্টি করা হয়েছে, খেলার মাঠ, পুকুর ও লেক কেন্দ্রিক বিনোদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত উদ্ভাবনী আইডিয়া : আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁতে কিছু উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে-

১. ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের স্তর থেকে সমবায়ীদের চাহিদামাফিক প্রশিক্ষণের (Need Based Training) উপায় বের করা এবং চাহিদামাফিক প্রশিক্ষণের তথ্য অনলাইনে প্রেরণের মাধ্যমে এক বছরের জন্যে একটি শক্তিশালী ডাটাবেইজ (2T model) তৈরি করা।
২. সমবায়ীদের আইজিএ প্রশিক্ষণ অধিকতর ফলপ্রসূ করতে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণের সাথে সমন্বয় করে 'দুই স্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান' ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে, সারা রাজশাহী বিভাগে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে আইজিএ প্রশিক্ষণসমূহ (টেইলারিং, ব্লক বাটিক, বিউটিফিকেশন ইত্যাদি) প্রদান করা হয়, সেই সকল প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে বাছাই করে অধিকতর আবাসিক প্রশিক্ষণের জন্যে আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁতে প্রেরণ করা হয়। এতে

অপরুপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাস

প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আইজিএ প্রশিক্ষণসমূহ মানব সম্পদ উন্নয়নে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও স্থানীয় সমবায় কার্যালয়সমূহের উদ্যোগে কোর্স ক্যালেন্ডার বহির্ভূত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

৩. শিশুস্বর্গ গঠন : সবুজে ঘেরা আমাদের এই ক্যাম্পাস হয়ে উঠুক শিশুদের উন্মুক্ত বিদ্যালয়, এই প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের ক্যাম্পাসের নামকরণ করা হয়ে হয়েছে শিশুস্বর্গ। ৫ বছরের বা এর কম বয়সি যেকোনো শিশু এখানে বিনা অনুমতিতে ঢুকতে পারে, খেলতে পারে এবং এর নান্দনিক সৌন্দর্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে, যা থেকে শিশুরা জাতির পিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

৪. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' এর ম্যুরাল স্থাপন : জাতির পিতা গভীরভাবে একজন সমবায়ী নেতা। তিনি সমবায়ের মাধ্যমে দেশের সকল উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। আগত প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও মহিমা জানানোর জন্যে ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে জাতির পিতার একটি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।

৫. ক্যান্টিন ব্যবস্থাপনা : 'নিজেরা নিজেদের কাজ করি ও করব' এই স্লোগানের আওতায় আমরা ক্যান্টিনে খাবার গ্রহণ করি, খাবার শেষে বর্জ্যব্যবস্থাপনা করি এবং নিজের প্লেট নিজে ধুয়ে ক্যান্টিনের সুন্দর কর্মপরিবেশ বজায় রাখি।

৬. পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম এবং পলিথিন ও ধূমপান মুক্ত পরিবেশ গঠন : এখানে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি আমাদের আহ্বান ও স্লোগান, 'আপনাকে কিছুই পরিষ্কার করতে হবে না, কেবল আপনার হাত দিয়ে কিছু অপরিষ্কার করবেন না'। এই স্লোগানের মাধ্যমে আমরা সবাই মিলে আসই, নওগাঁর সবুজ ক্যাম্পাস পরিষ্কার রাখি। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা ক্যাম্পাসটিকে পলিথিন ও ধূমপানমুক্ত ক্যাম্পাস হিসেবে ঘোষণা করেছি (১৭ অক্টোবর, ২০২০খ্রি.)।

৭. 'জয়িতার চাকা' ও 'ক্ষত' স্থাপন : কোনো উপাদানই ফেলনা নয়। বহুদিনের পুরোনো দ্বিচক্রযান রং করে স্থাপন করা হয়েছে স্থাপত্যকর্ম 'জয়িতার চাকা', যা নারীর ক্ষমতায়নকে নির্দেশ করে। পুরাতন বিদ্যুতের লোহার খুটি দিয়ে 'ক্ষত' নামক আরেকটি স্থাপত্যশিল্প স্থাপন করা হয়েছে, যা উৎসর্গ করা হয়েছে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে শহিদ বুদ্ধিজীবীদেরকে। এতে আসই, নওগাঁর সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮. লাইব্রেরি, রুফটফ ক্যান্টিন ও স্টোররুম : সীমিত অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহারের নিমিত্তে প্রশাসনিক ভবনের ছাদে ব্যবহার করে সেখানে একটি পৃথক লাইব্রেরি, একটি স্টোররুম ও রুফটফ ক্যান্টিন স্থাপন করা হয়েছে। সিঁড়িঘরের স্টোর করা স্তুপাকার মালপত্র অপসারণ করা হয়।

৯. ইন্টেরিয়র ডিজাইন ও সিসিটিভি স্থাপন : ইতোমধ্যে অধ্যক্ষ-উপনিবন্ধকের অফিসঘর ইন্টেরিয়র ডিজাইন করে সিসিটিভিসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য কনফারেন্স রুম ইন্টেরিয়রের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে।

১০. গবেষণা : ২০২০-'২১ অর্থবছর থেকেই আসই নওগাঁ গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রমে মনোনিবেশ করে আসছে। ইতোমধ্যে দুইটি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে - ক) আসই, নওগাঁর প্রশিক্ষণ সেবা উন্নয়নে করণীয় খ) আসই, নওগাঁ কর্তৃক প্রদত্ত আইজিএ প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা যাচাই।

প্রশিক্ষণ বিষয়ক গঠনমূলক আলোচনা

দক্ষ মানব সম্পদ গঠন ও সুবিধাবঞ্চিত সমবায়ীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ বিষয়ে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. প্রশিক্ষণভিত্তিক প্রকল্প : সুবিধাবঞ্চিত সমবায়ীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে আইজিএ প্রশিক্ষণ নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নারী সমবায়ীগণের অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে।

২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, জেলা সমবায় কার্যালয়ের বিভিন্ন আইজিএ প্রশিক্ষণের সাথে সমন্বয় করে 'দুই স্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান' পদ্ধতি গড়ে তোলা যেতে পারে।

৩. স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে সমবায়ীদের জন্যে নতুন নতুন ট্রেডে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে।

৪. আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহকে গবেষণার জন্যে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা জরুরি।

শেষ কথা

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ'র একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্র্যান্ডিং সৃষ্টি, একটি আত্মনির্ভরশীল, সৌন্দর্যমন্ডিত, আকর্ষণীয়, আর্থিকভাবে গতিশীল একটি সমৃদ্ধ আধুনিক সুন্দর ও পরিকল্পিত ক্যাম্পাসে পরিণতকরণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন উদ্যোগটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নতুন নতুন ইনোভেশন গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি একদিন পরিণত হবে Center of Excellence এ।

মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন : অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ

করোনা ক্রান্তি ও সর্বসাধারণের সমবায়শিক্ষা

সোহেল নওরোজ

অসীমের পথে যাত্রাকারী মানুষ যখন মর্ত্য থেকে মহাকাশ বিজয়ের গল্প শোনাতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই আণুবীক্ষণিক এক ভাইরাস ওলটপালট করে দিল সমগ্র বিশ্ব। মানুষের ধ্যানধারণা, চিন্তাচেতনা আমূল বদলে গেল। ভূলোক বিজয়ের গল্প বাদ দিয়ে মানুষ উদগ্রীব হয়ে পড়ল করোনা বিজয়ের গল্প শুনতে। অতিমারি দিনেদিনে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে। এভাবে কখন যেন কোভিড ভাইরাস এসে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল আপন ঘরে! মৃত্যুর মিছিলে যোগ হতে শুরু করল পরিচিত-আপনজন। জীবন বনাম মৃত্যুর লড়াইটা বড্ড একপেশে হয়ে উঠল। আরও একবার বড় করুণভাবে উন্মোচিত হলো প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায়ত্ব। অতিমারিতে স্থবির হয়ে পড়ল দুর্বার গতিতে ছুটে চলা মানুষ আর তাদের জীবন। সবকিছু ছাপিয়ে একটা শব্দই বারবার উচ্চারিত হতে লাগল—মৃত্যু। চারপাশে মৃত্যুর মিছিল। এই কঠিন এবং অমোঘ সত্যের ভেতর দিয়েই শুরু হলো দিনযাপন। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হঠাৎ করেই আটকে গেল শৃঙ্খলে। পাশে থাকার প্রত্যয় নিয়ে জাগ্রত মানুষগুলো দূরত্বকেই বেছে নিল নিরাপত্তার খাতিরে। স্পর্শে জড়িয়ে গেল অবিশ্বাস। স্থবিরতা সবখানে। বিধিনিষেধের জালে আটকা স্বাভাবিক জীবন। এখনো সে অবস্থা পুরোপুরি দূর হয়নি। ভাইরাসের দৌরাত্ম্য হতে মুক্তি মেলেনি বিশ্ববাসীর।

স্থবিরতাও পুরোটা কাটেনি। এই অণুজীবকে বশে আনতে মানুষের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চলমান। বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তার মধ্যেই আরেকটা চ্যালেঞ্জ এসে হাজির হয়েছে—'বাঁচিয়ে রাখা'। নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার পথ খুঁজতে মানুষগুলোকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। করোনার থাবায় বিপর্যস্ত অর্থনীতির চাকায় হাত লাগাতে একটু একটু করে সামনে এগোচ্ছে মানুষ। বদলে যাওয়া বিশ্বটাকে নতুন করে সাজাতে হবে তাদেরকেই। মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসই পারে অতিমারিতে পর্যুদস্ত পৃথিবীটাকে নতুন করে সাজাতে। আর এ কারণেই করোনাকালে ও করোনাপরবর্তী সময়ে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আরও বেশি করে অনুভূত হচ্ছে।

করোনা নানাভাবে মানুষের ক্ষতি করেছে। তবে সবচেয়ে বড় আঘাতটা করেছে জীবন ও অর্থনীতির ওপর। বিশেজ্ঞদের ধারণা, এই করোনা মহামারির কারণে দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলোতে দারিদ্র্যের হার বাড়বে। তৃতীয় বিশ্বের মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এর ভুক্তভোগী হচ্ছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষেরা নেতিবাচক ফল ভোগ করতে শুরু করেছে। বেশি আয়ের মানুষগুলো হয়তো আর্থিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে; তবে তার জন্যও প্রয়োজন লম্বা সময় আর দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ। করোনা-প্রাদুর্ভাবের চূড়ান্ত সময়ে লকডাউনে সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ থাকার কারণে সংকট আরও তীব্র হয়েছে। দিনমজুর এবং সীমিত আয়ের মানুষগুলোর দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে। লকডাউনে বিপাকে পড়া দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ কাজে ফিরলেও যে আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা থেকে রাতারাতি উত্তরণ সম্ভব নয়। এর মধ্যে ব্যতিক্রম কেবল সমবায়ীরা। লক্ষ করলে দেখা যায়, করোনাকালীন বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী খুব সুন্দরভাবেই খেয়ে-পরে ভালো আছেন। তারা সবাই ক্ষুদ্র সঞ্চয়ধারী। বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রায় এক কোটিরও বেশি প্রান্তিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির নাগরিক কোনো না কোনো সমবায়ের সঙ্গে জড়িত এবং আশার কথা তাদের আয়ের ক্ষুদ্রাংশ তারা সঞ্চয় করে রাখছে দীর্ঘ সময় ধরে। করোনার মতো বৈরী সময়ে সমবায় কতটা ভূমিকা রাখতে পারে তা বোধ করি কমবেশি সবাই উপলব্ধি করেছে। প্রায় পৌনে দুই লাখ সমবায় সমিতির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ও ভবিষ্যৎ বুনিয়াদ গড়া মানুষগুলো করোনার আর্থিক দুর্গতি সেভাবে অনুভব করেনি। এই আপৎকালীন সময়ে সেই সঞ্চয়গুলোই তাদের রক্ষা করেছে। কেবল নিজেদেরকে রক্ষা নয়, অনেক সমিতি বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাতও বাড়িয়ে দিয়েছে। ত্রাণ নিয়ে ছুটে গেছে মানুষের দ্বারে। যা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

করোনা বৈশ্বিক মহামারি। তারপরও সব দেশে সমানভাবে থাবা বসাতে পারেনি। সমবায়ে অগ্রসর দেশগুলো করোনা মোকাবেলায় তুলনামূলকভাবে এগিয়ে ছিল। তেমনি দুটি দেশ— আইসল্যান্ড ও তাইওয়ান। করোনা প্রতিরোধে এই দুটি দেশ অসামান্য সাফল্য দেখিয়ে তালিকার ওপরের দিকে আছে। তারপর ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের নাম উচ্চারিত হচ্ছে। এই দেশগুলোর সাফল্যের পেছনে কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, তারা প্রায় একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছে। কৌশলটি সহজ। রাষ্ট্রগুলো দেশের সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে করোনা প্রতিরোধের অন্যতম সামাজিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হতে দিয়েছিল। ইজরায়েলও এই সাফল্যপ্রাপ্তদের কাতারে রয়েছে। সাফল্যের অন্যতম ক্রীড়নক সমবায়ীদের জোট অ্যাজিক—নিস্পেড। কেরালার সাফল্য নিয়ে আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে। এখানেও দারুণ সক্রিয় সমবায় সমিতিগুলো। আসল কৃতিত্ব তাদেরই। তারা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে সুস্বাস্থ্য রক্ষার পাহারাদারের ভূমিকা নিয়েছিল। জার্মানিতে সমবায়ীদের শীর্ষ সংস্থা ডিজিআরভির অসামান্য সক্রিয়তা, স্বেচ্ছাসেবা এবং সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য আশীর্বাদ হয়ে ওঠেছিল। করোনা জার্মানিকে বিপর্যস্ত করতে পারেনি, ডিজিআরভিও সেই কৃতিত্বের অন্যতম দাবিদার।

বাংলাদেশেও কিছু কিছু সমবায় সমিতি করোনা দুর্যোগের সময় সমবায়ী কর্মকাণ্ড দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে তার সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা। সমবায় আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে বেশিরভাগ সমবায় সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের নিষ্ক্রিয় থাকাটা দুঃখজনক। দেশিয় এনজিও এবং কিছু বাইরের সংস্থা সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করলেও তা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে সেভাবে পৌঁছাতে পারেনি। অথচ করোনাকালে দরকার ছিল একটি সমন্বিত কর্মসূচির। করোনাকেন্দ্রিক বিশেষ কর্মসূচি ও কৌশল উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের প্রয়োজনই বেশি ছিল। সমবায়-সংশ্লিষ্টতা থাকলে খুব সহজেই প্রত্যন্ত জনপদের মানুষের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হতো। তাদেরকে সেবার আওতায় আনা যেত অনায়াসেই। মোদ্দাকথা করোনাকালে সমবায়ের অপরিহার্যতা নানাভাবে প্রতীয়মান। করোনা মোকাবেলায় বা করোনার ক্ষতি সামলে উঠতে সমবায় কী শিক্ষা দিয়ে গেল, তা একনজর দেখে নেওয়া যাক।

সবার জন্য সঞ্চয়

কেবল ধনীরা নয়, খেটে খাওয়া মানুষের জন্যও সঞ্চয়ের বিকল্প নেই। করোনা প্রতিরোধে সরকারঘোষিত লকডাউনে যখন উপার্জনের সবগুলো পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন সঞ্চয়হীন মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিল না। অথচ সমবায়ী মানুষগুলো জমানো সঞ্চয় তুলে দিব্যি কঠিন দিনগুলো পার করে দিয়েছে। সমবায় দশের জন্য, তাই এখানে একসঙ্গে অনেক কাজ করা যায়। সদস্যদের সঞ্চয় থেকে টাকা উত্তোলনে হঠাৎ একটা চাপ পড়লেও সামলে ওঠা যায়। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ও তুচ্ছ নয়। এ সঞ্চয়ই দুর্যোগে সবচেয়ে বড় বন্ধু হতে পারে— করোনার কারণেই তা আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে। সঞ্চয় মানুষকে সার্বিক দিক থেকে শক্তিশালী করে, মনোবল বৃদ্ধি করে, সংকটের কাছে হেরে যেতে দেয় না।

জনসম্পৃক্ততা

যেকোনো পদক্ষেপ তত বেশি ফলপ্রসূ হয়, যত বেশি তাতে জনসম্পৃক্ততা থাকে। আর জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সমবায়ের চেয়ে ভালো কোনো পন্থা নেই। পৃথিবীর যেসব দেশ করোনা মোকাবেলায় সাফল্য দেখিয়েছে তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায়, তাদের সমবায়গুলোর দুটি উল্লেখযোগ্য অর্জন ও সাফল্য আছে। এক. সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মধ্যস্থতা করা। দুই. বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক দায়বদ্ধতা (করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি) পালনে সম্মত ও সক্রিয় করা। সমবায়ের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগগুলো সমন্বিতভাবে পরিচালিত হলে তা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে, ফলে কার্যকারিতা অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়।

সেবার বিকেন্দ্রীকরণ

করোনা নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা পাওয়া প্রতিটি রাষ্ট্রই তাদের প্রতিরোধ পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েছে। রাষ্ট্রগুলো তাদের স্থানীয় ও আঞ্চলিক সমিতিগুলোকে স্বেচ্ছাসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজে নিয়োজিত করেছে। সফল রাষ্ট্রগুলোর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতিনির্ধারক মহল এই শক্তিকে অবহেলা করেনি, বরং এর উপযোগিতা চটজলদি উপলব্ধি করেছে। সমবায় শক্তির যথাযথ প্রয়োগের বুদ্ধিমত্তাও দেখিয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারকেরাও সমবায়-কৌশল প্রয়োগের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আমলে নিবেন। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা এরই মধ্যে সোচ্চার হতে শুরু করেছেন। তারা বলছেন, রাষ্ট্র তথা

সরকারপ্রধানের দায়বদ্ধতা রয়েছে দুর্যোগে প্রান্তিক মানুষের পাশে থাকার। সমবায় সেক্টর মাধ্যম হিসেবে কাজ করলে হয়তো সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অনেকাংশেই পূরণ করার প্রক্রিয়ায় সহজতর হবে।

সঞ্চয়ে নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ

নারীরা কেবল সংসার সামলাতেই পারঙ্গম নয়, সঞ্চয়েও তারা পুরুষকে টেক্কা দিতে সক্ষম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের চেয়ে একটু বেশিই সফল হয়। নারীদেরকে সঞ্চয়ে সম্পৃক্ত করা গেলে পুরুষের মতো তারাও দুর্যোগকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। অনেক সমবায় প্রতিষ্ঠানে নারীরা বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প প্রস্তুত করে ব্যক্তি তথা সামষ্টিক আয়ের ব্যবস্থা করেছে। সমিতির সদস্য ছাড়া অন্যদেরও এতে কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত হচ্ছে। বর্তমানে সমবায়ের মোট সদস্যের মধ্যে মাত্র ২৩ শতাংশ নারী। এই হার আরও বাড়ানো গেলে প্রতিটি পরিবার উপকৃত হবে।

পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ

সমবায়গুলোকে পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমে আরও বেশি মনোনিবেশ করার সময় এসেছে। মহামারি-অতিমারির আঘাত আরও আসবে— ওয়াকিবহাল মহল সে রকমটিই মনে করে। তাই তারা এখনই সচেতন হওয়ার তাগিদ দিচ্ছেন। আমাদের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড কীভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং সে ক্ষতি প্রশমনে সমবায়ীরা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা নিয়ে ভাবতে হবে। সমবায়-উদ্যোগগুলোকে পরিবেশবান্ধব করা গেলে আগামীর জন্য তা সঞ্চয়ের মতোই কাজে দেবে। দুর্যোগ এলেও তা সহনীয় মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে না।

উৎপাদনমুখী সমবায়

উৎপাদনমুখী খাতগুলোকে টেকসই করা গেলে যেকোনো বিপর্যয় মোকাবেলা করা সহজ হয়। আশার কথা, প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সাথে আমাদের কৃষির উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি উন্নয়নে সমবায় পদ্ধতি যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারে। কৃষকরা সমবায়ী হলে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের মনোবলও বৃদ্ধি পাবে। দেশের প্রায় সব পেশার মানুষের সমিতি বা সংঘ রয়েছে। অথচ কৃষকদের মধ্যে সংঘ বা সমিতির চেতনা এখনও খুবই কম। সমবায় খামার গড়ে তোলার প্রবণতা ও মানসিকতার অভাবে কৃষির অধিকতর আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। কৃষকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য সমবায়ভিত্তিক যৌথ খামারব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার। সমবায়ের নীতি অনুসারে যার জমি তারই থাকবে, কেবল সবাই একত্রে কাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসল প্রত্যেকে জমি অনুপাতে ভাগ করে নেবে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে ভূমির খণ্ডবিখণ্ডতা হ্রাস পাবে এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব হওয়ায় উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

সবাই সবার জন্য

মানুষকে একক-চিন্তা থেকে সরে এসে সামষ্টিক চিন্তা করতে হবে। সমবায়ের মূলকথা হচ্ছে একতাই বল। সমবায়ীদের শক্তির উৎস পারস্পরিক নৈকট্যের সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্ববোধ। নিজের পৃথক অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে অপরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার নামই একতা। একতাবদ্ধ থাকলে শক্তি বৃদ্ধি পায়, মনে সাহস সৃষ্টি হয় এবং জীবনের সাফল্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। জাতীয় সংহতি বা একতা জাতিকে শক্তিশালী করে তোলে, উন্নতি ও সমৃদ্ধির শিখরে নিয়ে যায়। সভ্যতার অগ্রগতির পেছনেও কাজ করছে একতাবোধ। 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'— এই প্রবাদবাক্যে একতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। একতার মাঝেই জাতি তথা বিশ্বের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত। সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বড় লাভের আশা না করে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। কারণ দিনশেষে আমরা কেউ একা নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, 'কেবল একা খাব তা নয়, সবাইকে নিয়ে, সবাইকে দিয়ে খাব, সবাইকে নিয়েই কাজ করব, সেই চিন্তাভাবনাই সমবায়ে সব থেকে বেশি প্রয়োজন। আপনারা সেটাই করবেন, সেটাই আমরা চাই।'

যুবশক্তিকে জনশক্তিতে রূপান্তর

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরের অন্যতম মাধ্যম হলো সমবায়। বাংলাদেশের একটা বড় শক্তির জায়গা হলো এর বিপুল পরিমাণ যুবশক্তি। কেবল চাকরির পেছনে না ছুটে সমবায়ী শিক্ষা গ্রহণ করে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করলে তা ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের জন্য চরম কল্যাণকর হবে। দেশের উন্নয়নে যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মাটি, জল, বায়ু ও পরিবেশের উপাদানসমূহের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। সমবায়ের মূল চেতনা হলো সম্মিলিত উদ্যোগ। একার পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব নয় তা সম্মিলিত উদ্যোগে সহজে করা যায়। তরুণদের মেধা, শ্রম ও দক্ষতার সঙ্গে সমবায়ের চেতনা এক হলে যেকোনো পরিস্থিতিতে তারাই হতে পারে ভরসার কেন্দ্রস্থান। একতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হলে তারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

কোনো উদ্যোগই রাতারাতি সাফল্য পায় না। তার জন্য একটা দীর্ঘ মেয়াদের রূপরেখা তৈরি করে সে অনুযায়ী কাজ করতে হয়। সমবায়ের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। অল্প অল্প সঞ্চয় দীর্ঘমেয়াদে বড় হয়ে ওঠে। এই সঞ্চয়কে কাজে লাগিয়ে তখন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। আর্থিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি করা সম্ভব হয়। শুধু আর্থিক সমৃদ্ধিই নয়, দীর্ঘ সময় একসাথে সঞ্চয়ের ফলে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। ফলে অন্যের বিপদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসা সহজ হয়। সমবায়ের বড় সুবিধা হলো, আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সামাজিক বন্ধনও দৃঢ় হয়। বর্তমান সময়ে সামাজিক বন্ধনটাকে মজবুত করার জন্য বিস্তর গবেষণা-আলোচনা হচ্ছে। সমবায় এক্ষেত্রে এক নম্বর পছন্দ হতে পারে।

ওয়ার্ল্ড কো-অপারেটিভ মনিটরের তথ্যমতে, প্রায় ৩ মিলিয়ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ১২ শতাংশ মানুষ সমবায়ের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন। বিশ্বের কর্মরত জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশের সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমবায় সমিতির মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী একটা বড় শ্রেণির মানুষ সংগঠিত হচ্ছে, উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর পাশাপাশি সমবায়ের শিক্ষায় দীক্ষিত মানুষ নিজেদেরকে অপরের কল্যাণে নিয়োজিত করার যে প্রয়াস পায় তা অমূল্য। করোনা অতিমারি সমবায়ের আর্থিক ও সামাজিক গুরুত্বকে আরেকবার সামনে নিয়ে এসেছে। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করে সমবায়ে উদ্বুদ্ধ হতে পারলে লাভ হবে আমাদেরই। অন্যের দয়ার জন্য হাত পেতে না থেকে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ও যথেষ্ট স্বস্তি এনে দিতে পারে। করোনাকালে যা ব্যাপকভাবে দেখা গিয়েছে। আগামীর দুর্যোগ-মহামারির জন্য নানান প্রস্তুতির কথা শোনা যাচ্ছে, যার কোনোটাই সমবায়কে বাদ দিয়ে সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই সময় থাকতেই সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার বিকল্প কিছু নেই।

সোহেল নওরোজ, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা।

সমবায়ে খ্রিস্টান মূল্যবোধ

রাফায়েল পালমা

ঐতিহ্যগতভাবেই খ্রিস্টানরা সমাজসেবা ও নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। একইসাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে মর্যাদাশীল সমাজ গঠনে এদের জুরি নেই। এখানে মিথ্যাচার, লুকোচুরি, অনৈতিকতা ও দুর্নীতির কোনো স্থান নেই। কেননা খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হলো সততা ও নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে মর্যাদাশীল সমাজ গড়া।

বর্তমান প্রতিশ্রুতিশীল সরকার প্রধান জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এই সম্প্রদায়ের চেষ্টার ত্রুটি নেই। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সমবায়ের গোড়াপত্তনসহ চার্চ ও সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ সমাজসেবা উন্নয়নে খ্রিস্টানদের অবদানের কথাই ঘোষণা করে।

দেশের মূলস্রোতধারার মানুষের সাথে শত শত খ্রিস্টান ছাত্র-যুবক প্রতিবেশি দেশ ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান

অবদান রেখেছেন। জাতীয় চেতনায় বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায়ের আহবানে সাড়া দিয়ে দেশের সামষ্টিক উন্নয়নে তাগিদ সৃষ্টি করে সমবায়ের আন্দোলনকে জোরদার করে অনন্য অবদান রেখেছে তৎকালীন খ্রিস্টান সম্প্রদায়। দেশের সর্ববৃহৎ সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে এই সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই।

একাত্তরের পর বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে দেশকে বিশেষ স্থান করে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অবদান নেহায়েত কম নয়। দেশের আপামর মানব সম্পদকে উন্নতমানের জনসমষ্টিতে রূপদান করার লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি মিশনারি মিলে সামগ্রিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এখনও চলছে সেই চেষ্টা। দেশের অগণিত খ্রিস্টান আদর্শ জাতি গঠনেও সবচেয়ে বেশি যত্নশীল ছিল এবং আছে।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণসহ বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র ও জাতিকে নয়ে যে স্বপ্নগুলো ধারণ করছেন, সেগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ জাতীয় উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রেখেছে। শত শত বাংলাদেশি খ্রিস্টান বিদেশে কাজ করে তাদের অর্জিত অর্থ যুগ যুগ ধরে দেশে পাঠাচ্ছেন। অগণিত এনজিওর মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার এনে গ্রামে-গঞ্জে পিছিয়ে পড়া মানুষকে উন্নয়নের পথে সংযুক্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হচ্ছে জাতি-ধর্মবর্ণ সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে। তার মধ্যে দেশের জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

দেশমাতৃকার উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ফাদার চার্লস জে ইয়াং সিএসসি নামক একজন ক্যাথলিক যাজকের নেতৃত্বে সমবায়ের সূচনা হয় এই দেশে। পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে কতিপয় অ্যাংলো-বাঙালি দূরদর্শী খ্রিস্টান ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমবায় আন্দোলন কার্যক্রমকে পর্যায়ক্রমে আরো জোরদার করা হয়।

ফাদারের নেতৃত্বে গঠিত এই সমবায়ের জনপ্রিয় নাম 'ঢাকা ক্রেডিট'। সরকারের সমবায় অধিদপ্তরে এই সমিতি 'দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা' নামে নিবন্ধিত। পঁচিশ জন সদস্য ও ৫০ টাকা মূলধন নিয়ে সমিতিটি যাত্রা শুরু করলেও বর্তমান মূলধন দাঁড়িয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা, সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের মাসিক বেতনের সামান্য অংশ সঞ্চয়ের মাধ্যমে এই বৃহৎ মূলধন গড়ে তোলা চারটিখানি কথা নয়। এর পেছনে রয়েছে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিরলস শ্রম, সততা, লক্ষ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা।

উল্লিখিত সমবায় প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক পর্যায়ে ঋণ নেওয়া-দেওয়া কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে এর সেবার ব্যাপকতা-বৈচিত্র্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবসেবার বহুমুখী প্রয়োজন মেটানো নিয়ে এর কার্যক্রম দিনদিন এগিয়ে চলেছে।

আজ জন্ম নিলে কাল থেকে একটি শিশু এই সমিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে। বিষয়টি সমিতির ৮০টি প্রোডাক্টের একটি প্রোডাক্টের (বী-সেভার্স) অন্তর্ভুক্ত। প্রতিমাসে তাকে কমপক্ষে ৫০ টাকা সঞ্চয় করতে হয়। অভিভাবকের নেতৃত্বে তা করা হয়। বয়সবৃদ্ধির এক পর্যায়ে এই শিশুটি কিশোর বয়সে স্মার্ট সেভার্সে ও পর্যায়ক্রমে নিয়মিত সদস্যে পরিণত হয়। সমিতিটি শিশুকাল থেকেই মানুষকে সঞ্চয়ী মনোভাবাপন্ন করে তোলে।

উল্লেখ্য যে, একদিন থেকে একমাস বয়সি শিশু বি-সেভার্সের আওতায় আনা হলে সমিতি তার সঞ্চয়ী হিসেবে এককালীন ৫০০ টাকা প্রণোদনা হিসেবে দিয়ে থাকে। সমিতির বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে সমবায়ী শিক্ষায় বলীয়ান হয়ে উঠলে, এই শিশুই হবে সত্যিকারের সমবায়ী শিক্ষায় শিক্ষিত, যা গতানুগতিক বয়স্ক সদস্যদের চেয়ে গুণগতমানে থাকবে অনন্য।

ভিক্ষুকবিহীন সমাজ গঠনে সমবায়ের শিক্ষার্ কোনো বিকল্প নেই। কেননা জীবনের ঊষালগ্ন থেকেই মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা পেয়ে যাচ্ছে এই সম্প্রদায়ের শিশুরা। খ্রিস্টানদের এই কর্মকৌশল উন্নত ও মর্যাদাশীল জাতি গঠনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে চলেছে।

চার্চের দ্বারা পরিচালিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও একইভাবে নৈতিকতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সততার ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলেছে। সমবায় প্রতিষ্ঠানও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। ঢাকা ক্রেডিট তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

ওপরে উল্লিখিত সমিতি বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, গুণগত শিশুসেবাসহ তাদের প্রতিভা বিকাশ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, নির্মল বিনোদন, সকল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, সমবায় দোকান পরিচালনা, মেধাবী শিক্ষার্থী সদস্যদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করাসহ আরো হাজারো সুযোগ সৃষ্টি করছে এই সমবায় প্রতিষ্ঠান।

এই সমিতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় বাংলাদেশের বৃহত্তর খ্রিস্টান সমাজের দৃশ্যমান উন্নয়ন। এই সমবায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদ-পরিসম্পদের পরিমাণ প্রায় এক হাজার কোটি টাকা, সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার, কর্মী সংখ্যা প্রায় ৬০০ এবং এর রয়েছে ৮০টিরও বেশি প্রোডাক্ট ও প্রকল্প।

উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ঢাকার মণিপুরীপাড়ায় চাইল্ডকেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন সেন্টার, সিকিউরিটি সার্ভিস, হাউজিং প্রকল্প, সমবায় বাজার, স্বাস্থ্য প্রকল্প, ছাত্র ও উচ্চশিক্ষা প্রকল্প, বৃদ্ধ বয়সের পেনশন প্রকল্প, শিল্প ঋণ প্রকল্প ইত্যাদি। শিল্প ঋণের জন্য সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়। এছাড়াও নানা ধরনের ঋণের সুব্যবস্থা রয়েছে এই সমিতিতে।

সমিতির স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সর্বশেষ যে প্রকল্প নিয়ে কাজ চলছে তা হলো ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল নির্মাণ। ঢাকার পূর্বাচলের সন্নিকটে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জের মঠবাড়িতে জাতি-ধর্মবর্ণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্প থাকবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বর্তমানে এই সমিতি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার মধ্যে কর্মরত। সফলতায় ভরপুর এই সমিতির গল্প যুগ যুগ ধরে লিখলেও তা শেষ হবার নয়। তাই বলা যায়, একজন মানুষের জন্মকাল থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বৈষয়িক প্রয়োজনের যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে এই সমিতিতে। কেননা, দেশের সকল অঞ্চল থেকে খ্রিস্টান মানুষেরা রাজধানীতে আসে চাকরিসহ জীবনের তাগিদে।

মরণের পরেও একজন সদস্যকে জরুরি সেবা দেয় সমিতির নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স। নিয়ে যাওয়া হয় তার গ্রামের বাড়ির গন্তব্যে। সৎকারের জন্য পৌঁছে দেওয়া হয় গির্জার কবরস্থানে। এর চেয়ে মানুষের আর কি চাওয়া থাকতে পারে! সৎকারের আর্থিক ব্যবস্থাটাও সমিতি করে থাকে আন্তরিকতার সাথে। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমিতির সাথে থাকাটা যেন মানুষের মজ্জাগত প্রবণতা। তাই খ্রিস্টানদের জীবনেও সমিতি, মরণেও সমিতি; সমিতিই যেন তাদের চিরসঙ্গী। আর্থিক প্রয়োজনে সদস্যদের পিতামাতার পরই মনে পড়ে সমিতির কথা।

ঢাকা ক্রেডিকে অনুসরণ করে বাংলাদেশের প্রতিটি চার্চে গঠন করা হয়েছে সমবায় সমিতি। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মীদের মধ্যে গঠন করা হয়েছে সমিতি। বর্তমানে বাংলাদেশে কয়েক শ খ্রিস্টান সমিতি (সরকারের নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত)।

আধুনিক যুগে সমিতিগুলোর মধ্যে নানা সমস্যার মধ্যে মধ্যে ঋণখেলাপি একটি বড় ধরনের সমস্যা। এছাড়াও সমিতে বৃহত্তর হওয়াতে পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। সেগুলোতে টেকনিক্যাল সহায়তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকা ক্রেডিটের সহায়তায় ও পরামর্শে পর্যায়ক্রমে কালব ও পরে দি সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন অফ খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস লিঃ (কাকেকা) গঠন করা হয়েছে। ঢাকা ক্রেডিটের শিক্ষা তহবিলের অর্থ ব্যয় করে কালব সৃষ্টি হলেও এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সকল সমিতির নিরীক্ষা করে থাকে, দিয়ে থাকে নানা প্রশিক্ষণ।

অন্যদিকে, কাকেকার প্রধান উদ্দেশ্য হলো খ্রিস্টান কো-অপারেটিভগুলোর মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা, প্রশিক্ষণ প্রদান করা। একই সদস্য একাধিক সমিতিতে সদস্যপদ গ্রহণ করে যেন মাত্রাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করতে না পারে, তার জন্য সফটওয়্যার তৈরি করে সার্বক্ষণিক মনিটর করা। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে গড়ে উঠবে প্রশিক্ষিত সমবায় সমাজ।

সমবায়ের মূল স্পিরিট তৈরি করতে পারলে দেশ এগিয়ে যাবে সঠিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে। পূর্ণ হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ, কমে আসবে ধনী-গরিবের ব্যবধান, পূর্ণ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা। সোনার বাংলা গড়ার শপথ নিয়ে সার্থক হোক আজকের এই ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বরের জাতীয় সমবায় দিবস।

রাফায়েল পালমা : সমবায়ী

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

তৎকালীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজের সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গমাতা কবিতাটি রচনা করেন। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে এই কামনা করেন যেন বাঙালিরা বঙ্গদেশের প্রতি কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করে!

কবিতার শেষ ২টি লাইন ছিল

সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি।

১২ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধু কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বিশ্বকবি তুমি বলেছিলে 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি। 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তুমি দেখে যাও, তোমার আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি।'

হ্যাঁ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা এর হাত ধরেই এসেছে বাঙালি জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্তি। কবিগুরুর সময়কালীন বঙ্গমাতাদের প্রতি কবির যে আক্ষেপ; তা মোচন করেছেন পরবর্তী প্রজন্মের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা। কারণ জাতির পিতা

বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের চলমান 'কাপড়ের উপর চিত্রাংকনের কাজ'

বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছেন...

"রেণু আমার পাশে না থাকলে এবং আমার সব দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, বারবার কারাবরণ, ছেলেমেয়ে নিয়ে অনিশ্চিত জীবনযাপন হাসিমুখে মেনে নিতে না পারলে আমি আজ বঙ্গবন্ধু হতে পারতাম না।"

বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধু হওয়ার পেছনে একজন মহীয়সী নারী পেছন থেকে প্রেরণা দিয়েছেন, শক্তি জুগিয়েছেন, হয়েছেন সকল কাজের প্রেরণাদায়ী। তিনি হলেন রেণু- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধুর সংকটে সংগ্রামে আদর্শিক এক নির্ভীক সহযাত্রী। বাঙালি জাতির সতত প্রেরণাদায়ী বঙ্গমাতা। বঙ্গমাতা : নিভৃতে উৎসর্গিত মহাজীবন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ তিনি। সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত না থেকেও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎস ছিলেন বেগম মুজিব। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জাতির পিতার পাশে থেকে দেশ ও জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। তার কর্মের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন একটি সংগ্রামমুখর জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে জীবন কোটি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের সাথে দ্বিধাহীনভাবে যুক্ত হয়েছিল ত্যাগ ও নিপীড়ন মোকাবেলা করবার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞায়।

বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার। বঙ্গবন্ধু এদেশের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক অগ্রগতির পন্থা হিসেবে সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গভীরভাবে সমবায়বান্ধব মহান নেতা। তিনি ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, "আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।"

দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু আত্মনিয়োগ করেছিলেন সোনার বাংলা গঠনে। আর এই সোনার বাংলা বিনির্মাণে তিনি পুরুষ ও নারীর সমান অংশগ্রহণ চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু নারীকে কখনোই বিচ্ছিন্নভাবে দেখেননি, সমাজ-ভাবনার আলোকিত মানুষ হিসেবেই দেখেছেন। এখানেই নিহিত আছে নারী উন্নয়ন ভাবনার মৌলিক চেতনা। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনদর্শনে নারী-পুরুষের সমতার সত্যকে ধারণ করেছিলেন। নারীকে অবদমন করা তাঁর সামগ্রিক জীবনের কোথাও প্রতিফলিত হয়নি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক সমাজ পাটাতনে জেন্ডারের তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে মানবিক বোধ ধারণ করেছিলেন। নারীর অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর প্রত্যয় ছিল দৃঢ় ও অবিচল। নারীর অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধু সমবায়কে সহায়ক মাধ্যম হিসেবে নিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন, নারীর অগ্রযাত্রা বাস্তবায়নের জন্য তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঘোষণা করেন। নারীর সার্বিক উন্নয়নে বিশেষত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এর কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচিগত কৌশল বিষয়ে ৪৭ নং অনুচ্ছেদে আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সমবায় অনেক আগে থেকেই নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২ এর ৪.০৭ ও ৭.১৩ এবং ৯.১০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জাতীয় সমবায় নীতির প্রেক্ষিতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর জেলার যশোর-৫ আসনের গণমানুষের নেতা, পরপর দুইবার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পতাকাবাহক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

অতি আস্থাভাজন জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহোদয় নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার আদর্শকে নারী সমাজের মধ্যে সঞ্চারণ এবং সোনার বাংলা বিনির্মাণে সমবায়কে অন্যতম সহায়ক মাধ্যম হিসেবে নিয়ে তিনি বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সুপ্রশস্থ বুকে রয়েছে এদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা! আর এই অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে এ মহতী উদ্যোগ গ্রহণ। প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নে ১টি করে বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। ইতোমধ্যে এ উপজেলায় ০৪টি ইউনিয়নে ৪টি বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। যা নিম্নরূপ :

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে মহিলা সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

- সরকারি সহযোগিতায় মহিলা সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।
- সমিতির নির্ধারিত প্রকার ও শ্রেণির উদ্দেশ্যকল্পে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যেকোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।
- সমিতির কর্মএলাকায় স্থানীয় সংগঠন, কমিটি ও প্রশাসনের সহযোগিতায় মহিলা সদস্যগণের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।
- দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সমিতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যেকোনো কার্যক্রম গ্রহণ।
- ব্যক্তিগতভাবে সভ্যগণকে এবং সমষ্টিগতভাবে সংগঠনকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সভ্যগণকে নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত সম্পদ সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- মহিলাদেরকে পুনর্বাসন, ক্ষমতায়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করা ;
- সভ্যগণের কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধির জন্য পেশাভিত্তিক অর্থকরী, বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ;
- সভ্যদেরকে আধুনিক উপায়ে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, ইহাদের খাদ্য, রোগবালাই এবং ঔষধপত্র বিষয়ে যাবতীয় সাহায্য করা;
- বাল্যবিবাহ,যৌতুক প্রথা, ইভ টিজিং এবং এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা;
- সদস্যদের মধ্যে সাম্য, সততা, সহযোগিতা, একতা, সংহতি প্রভৃতি মানবিক নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা ও অগ্রগতিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করা,
- সমবায় সমিতির পুঁজির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উক্ত পুঁজি উৎপাদনমুখী ও লাভজনক খাতে দক্ষভাবে বিনিয়োগ করার বাস্তব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সক্ষম করে তোলার জন্য সমিতির সদস্যগণকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ধারণা এবং পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

সমিতিগুলোর প্রাথমিক বর্তমান কার্যক্রম

ক) পুঁজি গঠন সংক্রান্ত: সমবায় সমিতি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমিতিতে পুঁজি গঠন। সে লক্ষ্যে এ সকল সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। সদ্য নিবন্ধিত এ সকল সমিতির ১৫/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গঠিত মূলধনের পরিমাণ ২,৩০,০০০ টাকা।

খ) অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ: ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। আর্থিক সচ্ছলতা মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সাধারণ মহিলাদের আর্থিক উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এবং তাঁদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সচ্ছলতা ফিরে আনার নিমিত্তে এ সকল সমিতির সদস্যদের মধ্যে মতবিনিময়ের লক্ষ্যে নিয়মিত উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে নারীদের পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা তাদেরকে ক্ষমতায়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।

গ) দক্ষ মানব সম্পদ ও নারী উদ্যোক্তা সৃজন : নারীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ, আর্থিক প্রণোদনা বা ঋণ সহায়তায় দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরে সমবায় মাধ্যম অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সমবায়ভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণদান এবং নারীর উৎপাদিত পণ্য সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নারীর আয় নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ সকল সমিতির অনুকূলে মোট ৭টি আইজিএ (আয়-বর্ধনমূলক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক আইজিএ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হলো :

আইজিএ (কাপড়ের ওপর চিত্রাঙ্গনের কাজ) প্রশিক্ষণ ২৫ জন
২১/৩/২১ হতে ২৫/৩/২১ পর্যন্ত ৫ দিন
আইজিএ (দর্জি) প্রশিক্ষণ ২৫ জন ৩০/৫/২১ হতে ৩/৬/২১ পর্যন্ত ৫ দিন
''পণ্যের মানোন্নয়নে ফ্যাশন এবং চিত্রকলার প্রভাব'' আইজিএ প্রশিক্ষণ ২৫ জন
৩০/৫/২১ হতে ৩/৬/২১ পর্যন্ত ৫ দিন
''পণ্যের মানোন্নয়নে ফ্যাশন এবং চিত্রকলার প্রভাব'' আইজিএ প্রশিক্ষণ ২৫ জন
৬/৬/২১ হতে ১০/৬/২১ পর্যন্ত ৫ দিন
''পণ্যের মানোন্নয়নে ফ্যাশন এবং চিত্রকলার প্রভাব'' আইজিএ প্রশিক্ষণ ২৫ জন
৬/৬/২১ হতে ১০/৬/২১ পর্যন্ত ৫ দিন
''পণ্যের মানোন্নয়নে ফ্যাশন এবং চিত্রকলার প্রভাব'' আইজিএ প্রশিক্ষণ ২৫ জন
১৩/৬/২১ হতে ১৭/৬/২১ পর্যন্ত ৫ দিন
''পণ্যের মানোন্নয়নে ফ্যাশন এবং চিত্রকলার প্রভাব'' আইজিএ প্রশিক্ষণ ২৫ জন
০৫/৯/২১ হতে ৯/৯/২১ পর্যন্ত ৫ দিন

ঘ) উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড

'...আমি কেবল জানি
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ''মুক্তি'' কবিতায় চিরায়ত বাংলার নারী সমাজের যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে এ সকল সমিতির সদস্যগণ গৃহস্থালি কার্যক্রম সম্পন্ন শেষে আইজিএ প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত জ্ঞানের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে ইতোমধ্যে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন। সদস্যদের সততা, পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠতার সহিত এ উৎপাদনমুখী কর্মযজ্ঞ এ সকল সমিতিকে একটি আদর্শ উন্নয়নমুখী এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রুপদানে সক্ষমপূর্বক সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সমিতিতে উৎপাদিত পণ্যসমূহ

নকশিকাঁথা, শাড়ি, থ্রিপিচ, কুশন কভার, বেড কভার, ওয়াল ম্যাট ইত্যাদি।

ঙ) নারীর জাগরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি

সমবায় সমিতি গঠন এবং এর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীর মৌলিক অধিকার যেমন-শিক্ষা,

বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের চলমান দর্জি প্রশিক্ষণ

স্বাস্থ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আত্মোপলব্ধি প্রবলসহ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের অবস্থানের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে; নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতার জন্য এ সকল সমিতির সদস্যদের মধ্যে মতবিনিময়ের লক্ষে নিয়মিত উঠান বৈঠকসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

চ) নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী নেতৃত্ব সৃজন

নারী শক্তির প্রতীক-নারী উন্নয়নের প্রতীক। নারী তার নিজ যোগ্যতায় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে, নিজের মধ্যে সঞ্চিত অদৃষ্ট শক্তি যার মাধ্যমে নিজের ভেতরে অপ্রকাশিত থাকা প্রতিভাকে আপন মহিমায় প্রস্ফুটিত করতে পারেন; সেই লক্ষ্যে এ সকল সমবায় সমিতি পুরুষ নির্ভরতা বাদ দিয়ে নিজেরকে ক্ষমতায়নকরণ এবং নেতৃত্ব সৃজনের জন্য নিজের দ্বারা নিজেরা পরিচালিত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায়ের গণতান্ত্রিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে আগামীতে এখান থেকে সৃজিত নেতৃত্ব জাতীয় পর্যায়ে ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষ

এক অসামান্য আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ় মনোবল, সাহস এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন বঙ্গমাতা। তিনি ছিলেন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের এক অনন্য প্রতীক। এই মহীয়সী নারী ছিলেন প্রচারবিমুখ। পর্দার অন্তরালে থেকে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর ত্যাগ, দেশপ্রেম ও আদর্শ অনন্তকাল আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। এরই প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের ঐতিহাসিক মহতী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যাত্রা। বঙ্গমাতার আদর্শ হৃদয়ে ধারণ, লালন এবং পালন করা এ সকল বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রত্যেকটি সদস্যের অবধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব এ সকল সমবায় সমিতির নারীর সার্বিক উন্নয়ন। এর ফলে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি ঘটবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস-আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা। আর তখনই সার্থক হবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর সুবিখ্যাত 'নারী' কবিতা; যেখানে তিনি বলেছেন…

'সেদিন সুদূর নয়—
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাইবে নারীরও জয়।'

মোঃ জিল্লুর রহমান: সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় দপ্তর, চৌগাছা, যশোর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও সহায়ক তথ্যসূত্র

১. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী।
২. নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা-সেলিনা হোসেন।
৩. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় পরিকল্পনা।
৪. জাতীয় সমবায় নীতি ২০১২।
৫. সমবায় পত্রিকা : নভেম্বর ২০২০ বিশেষ সংখ্যা।
৬. দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক যুগান্তর।

বঙ্গবন্ধুর সাহচর্যে রাজনীতি এবং রাজনীতিক থেকে সমবায়ী মরহুম রওশন আলী

যশোরের কৃতী সন্তান, বঙ্গবন্ধুর সহচর, সংবিধানের রূপকার, প্রবীণ আইনজীবী, বিশিষ্ট সমবায়ী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এড. এম. রওশন আলী এমপি, ইংরেজি ১৯২১ সালের ১৫ এপ্রিল এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মস্থান যশোর কোতোয়ালি থানাধীন তেঘরিয়া গ্রামের মাতুলালয়।

মরহুমের পিতৃনিবাস যশোর শহরতলীর নওদা গ্রামে। তার পিতা মরহুম মান্দার আলী ও মাতা মরহুমা খোদেজা বেগম। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ।

শিক্ষা জীবন

এড. এম, রওশন আলী নিজ গ্রামের প্রাইমারি স্কুল হতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর যশোর সম্মিলনী ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। সেখান থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৩৯ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে অধ্যায়নের জন্য কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে তিনি ১৯৪১ সালে উচ্চমাধ্যমিক ও ১৯৪৩ সালে স্নাতক পাস করেন। তিনি ১৯৫১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে

আইনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

পেশা জীবন

তিনি ১৯৫২ সালে যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন এবং যশোর দড়াটানায় অবস্থিত পারিবারিক ভবন "আলী মঞ্জিল" এর দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষ চেম্বার হিসেবে ব্যবহার করে ১৯৫২ সাল হতে আইন পেশায় নিয়োজিত হন।

রাজনৈতিক জীবন, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও সংবিধান প্রণয়নে ভূমিকা

তার রাজনৈতিক জীবন ছিল অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি যশোরের আরেক কৃতী সন্তান প্রাক্তন মন্ত্রী এড. মশিউর রহমান, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এড. আব্দুল খালেক ও এড. হাবিবুর রহমানের সাথে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন।

তিনি ১৯৫৫ সালে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং একাধারে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইতোমধ্যে তিনি ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

পরবর্তীতে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে মহান দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৫ সালে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

দেশ ও জনগণের প্রতি ত্যাগ ও ভালোবাসায় তিনি ছিলেন একজন অনন্য সাধারণ ব্যাক্তিত্ব এবং তিনি ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের প্রতীক নিয়ে যশোর সদর ও বাঘারপাড়া আসন থেকে এম,এন,এ নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালের মার্চে বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সামনের সারি থেকে নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করার জন্য গঠিত তিন সদস্যবিশিষ্ট রিক্রুট কমিটির তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। একই সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ৮ নং সেক্টরের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত সংবিধান প্রণয়ন বিধি কমিটির সদস্য ছিলেন।

তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পার্থী হিসেবে যশোর সদর আসন(যশোর -৩) থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি ১৯৭৫ সালে যশোর জেলা গভর্নর হিসেবে নির্বাচিত হন।

পরবর্তীতে তিনি ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোর ৩ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ গণপরিষদেরও অন্যতম সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা

তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে সকলের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

যশোরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম প্রতিষ্ঠান যশোর ইনস্টিটিউটে ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯ বছর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

ইতিপূর্বে ১৯৪২ সালে তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সার্বিক সহযোগিতায় মোমিন নগর সমবায় শিল্প ইউনিয়ন, যশোর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মোমিন নগর সমবায় শিল্প ইউনিয়নের পর্যায়ক্রমে সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮৫ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে তিনি প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিঃ, ঢাকা এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন এর সফল সভাপতি হিসেবে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন ঐ সময় তার বিরল নেতৃত্বের ফলে দেশে সমবায় ইতিহাসের এক স্বর্ণ যুগের সূচনা করে। ঐ সময়কালে ১৯৭২ হতে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের সমবায় প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, জাপান, পোলান্ড, বুলগেরিয়া, সুইডেন, হাঙ্গেরি, ইতালি, থাইল্যান্ড ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৭৩ সালে তাঁর মস্কো সফর তার স্বাক্ষরিত প্রোটকলের আওতায় আজও এদেশ থেকে সমবায় প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণ প্রতিবছর রাশিয়াতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যান।

তিনি ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ কো অপারেটিভ ইনসিওরেন্স এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক নির্বাচিত হন। ঔপনিবেশিক আমলের সমবায় আইন ও উপবিধির পরিবর্তে আজ দেশে যে নতুন সমবায় আইন ও উপবিধি চালু হয়েছে, তার জন্য পরিচালিত দীর্ঘ আন্দোলনের সূচনালগ্নের প্রথম সারির একজন কর্মী ও নেতা হিসেবে জনাব মরহুম রওশন আলী তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

এছাড়া খাজুরা শহীদ সিরাজউদ্দিন হোসেন কলেজ, কাজী নজরুল ইসলাম কলেজ, যশোর সিটি কলেজ, উপশহর মহাবিদ্যালয়, শহীদ মশিউর রহমান 'ল 'কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৮২-'৮৩ এবং ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনবার জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ছিলেন।

সম্মাননা ও স্বীকৃতি

১৯৮৫ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক পান। ১৯৯৪ সালে যশোরের স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন জাগরণী চক্র তাঁকে যশোরের শ্রেষ্ঠ সন্তান পদকে ভূষিত করে।

পরিবার পরিচিতি

তিনি ১৯৪০ সালে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মরহুমা লুৎফুন্নেসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পারিবারিক জীবনে তিনি তিন পুত্র ও চার কন্যাসন্তানের জনক ছিলেন।

পরলোক গমন

১৯৯৪ সালের ১৯ আগস্ট তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ছিলেন দলমত নির্বিশেষে যশোরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ও সবার প্রিয় মুখ। তাই তাঁর মৃত্যুতে যশোরে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হয় এক বিশাল শূন্যতা।

তথ্যসূত্র :
জেলা সমবায় কর্মকর্তা, যশোর

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সভা অনুষ্ঠিত

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রস্তুতিমূলক সভা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মো. মশিউর রহমান এনডিসি, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন পালন

শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস অদম্য আত্মবিশ্বাস

গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে শহিদ শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরে শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি। এ সময় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সকল উপজেলায় ‘বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি’ গঠনের উদ্যোগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি বলেছেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের প্রতিটি উপজেলায় "বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি" গঠনের উদ্‌যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সমিতি গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। সমিতির সদস্য সংখ্যা হবে ৭১ জন। এর মধ্য দিয়ে আমরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করতে চাই। গত ৯ আগস্ট ২০২১ সালে সচিবালয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গমাতা জাতির মুক্তির জন্য এক অদৃশ্য শক্তি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে উজ্জীবিত করেছেন, নেপথ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আমৃত্যু জীবনসঙ্গী হিসেবে পরম মমতায় বঙ্গবন্ধুকে আগলে রেখেছেন এই মহীয়সী নারী। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে সংবিধানের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার সেই অসমাপ্ত কাজটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মো. রেজাউল আহসান, বিআরডিবির মহাপরিচালক সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক আয়োজিত ২০২০ সালের এস এস সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক মোঃ রিয়াজুল কবির ও ঢাকা জেলা সমবায় অফিসার মোঃ শিহাব উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রকাশনা ‘‘বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ’’-এর মোড়ক উন্মোচন করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

‘বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ’ প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি বলেছেন, জাতির পিতা আমৃত্যু শোষিত মানুষের পক্ষে লড়াই করে গেছেন। জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে শোষক শ্রেণি, আরেক ভাগে শোষিত। আমি শোষিতের দলে। ১৯ জুলাই ২০২১ সালে সচিবালয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত ‘‘বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ’’ শীর্ষক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব’কথা বলেন। এসময় তিনি বলেন, জাতির পিতা বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন আত্মপরিচয় দিয়ে গেছেন। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। জাতির পিতার স্বপ্নসাধ পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন বলেই পৃথিবীতে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। স্বপন ভট্টাচার্য্য আরো বলেন, পৃথিবীতে প্রায় ৪০ কোটি বাঙালি রয়েছে। বাংলাদেশের ১৭ কোটি বাঙালিই শুধু এই স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে। বঙ্গবন্ধু দেশটা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন বলেই আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমরা স্বাধীন। বঙ্গবন্ধু এদেশ স্বাধীন করেছেন বলেই আমরা আজ উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে পারছি। সভাপতির বক্তব্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল আহসান বলেন, জাতির পিতার বর্ণাঢ্য গৌরবময় রাজনৈতিক জীবনের নানা বিষয়, সমবায় উন্নয়ন ভাবনা, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে গৃহীত নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরা হয়েছে প্রকাশনাটির বিভিন্ন লেখায়, নিবন্ধে। স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ছিল যার স্বপ্ন, সেই অনন্য মানুষটির অসামান্য অবদান, দীর্ঘ সংগ্রামমুখর জীবনের নানা বিষয় একটি প্রকাশনায় পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরা অসম্ভব। তিনি প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ‘‘বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ’’ শীর্ষক প্রকাশনা অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, বিআরডিবির মহাপরিচালক সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস, পিডিবিএফ এর এমডি মউদুদউর রশীদ সফদার, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মো. রেজাউল আহসানের অবসরজনিত বিদায় এবং নবনিযুক্ত সচিব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি-এর দায়িত্ব গ্রহণ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য থাকলে আমরা দ্রুত দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে পারব। দেশকে উন্নত করতে হলে প্রত্যেকটি মানুষকে উৎপাদনশীল হতে হবে। এ সময় তিনি বিদায়ী সচিবের কাজের দক্ষতা ও আন্তরিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৯ আগস্ট ২০২১ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সচিব মো. রেজাউল আহসান এর অবসর জনিত বিদায় এবং নবনিযুক্ত সচিব মোঃ মশিউর রহমান (এনডিসি)এর দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এসব কথা বলেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন,সেই আদর্শ সমুন্নত রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বিদায়ী সচিবকে অত্যন্ত দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল আহসান অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভাগের দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে গতিশীলতায় তাঁর ভূমিকা উল্লেখ করার মত। প্রতিমন্ত্রী এ সময় আশাবাদ ব্যক্ত করেন নবনিয়োগপ্রাপ্ত সচিব এ বিভাগের চলমান কার্যক্রম একই ধারাবাহিকতায় দক্ষতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল আহসান প্রায় ৩২ বছরের সফল কর্মজীবন শেষে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

গত ১৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান (সচিব) মোঃ মশিউর রহমান (এনডিসি) কে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব হিসেবে পদায়ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি দায়িত্বগ্রহণ করেন। নবনিযুক্ত সচিব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি মাঠ প্রশাসনে নাটোরের জেলা প্রশাসক, সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার এবং ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অতিরিক্ত সচিব মোঃ রাশিদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমেদ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সকল দপ্তর/ সংস্থার প্রধানগণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতার সমাধিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের শ্রদ্ধা নিবেদন

গত ৩১ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নবনিযুক্ত সচিব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি। এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন। জাতির পিতার সমাধিসৌধে সংরক্ষিত পরিদর্শন বইয়েও স্বাক্ষর করেন সচিব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি।

এ সময় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর ঢাকার যুগ্ম নিবন্ধক মোঃ রিয়াজুল কবীর, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ কে এম হেদায়েতুল ইসলামসহ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমবায় অধিদপ্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন পালন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিনে সমবায় অধিদপ্তরের অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ও সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক

মতবিনিময় সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি বক্তব্য প্রদান করছেন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি পরিদর্শন

বিগত ২৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি পরিদর্শন করেন। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি অঞ্জন কুমার সরকার এবং উপাধ্যক্ষ মোঃ জিয়াউল হক সচিব মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। তিনি সমবায় একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এর সাথে মতবিনিময় করেন এবং সমবায় একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নসহ একাডেমির মানোন্নয়নে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা (সমবায় বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পিডিবিএফ, এসএফডিএফ, সিভিডিপি) এর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় সভা বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক মোঃ শাহজাহান এবং অধ্যক্ষ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি অঞ্জন কুমার সরকার উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দপ্তর সমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চান এবং দাপ্তরিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি সকলকে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সততার সাথে কাজ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকার দ্বি-মাসিক উন্নয়ন সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

সভায় বক্তব্য রাখছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি পরিদর্শন

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সমবায় একাডেমিকে Centre of Excellence হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিগত ২২ আগস্ট ২০২১ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী জেলা সমবায় কর্মকর্তাদের সাথে সমবায় কার্যক্রম উন্নয়নে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক একাডেমিতে সমবায় বিষয়ক গবেষণা, উচ্চতর সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ, প্রশিক্ষণের গুণগতমানের ইতিবাচক পরিবর্তন, ক্যাম্পাসের পরিচ্ছন্নতা ও নান্দনিকতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, হোস্টেলে প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা-খাওয়ার মান উন্নয়নসহ হোস্টেল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিকে একটি আধুনিক মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

রিফ্রেসার্স কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, অতিরিক্ত নিবন্ধক (প্রশাসন, মা.স.উ ও ফাইন্যান্স), অধ্যক্ষ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী

নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের সাথে বরিশাল সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের মতবিনিময়

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস গত ২৮ আগস্ট ২০২১ তারিখ বরিশাল আগমন করেন। তিনি শের-ই-বাংলা আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, বরিশাল এ বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল কর্তৃক আয়োজিত বিভাগাধীন সকল জেলা সমবায় অফিসার এবং সদর জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সকল কর্মচারী ও বিশিষ্ট সমবায়ীদের সাথে স্বাস্থ্য বিধি মেনে মতবিনিময় সভায় অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন মুহাম্মদ আবদুল্লা আল মামুন, যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস. এম. আক্তারুজ্জামান, ডিআইজি, বরিশাল।

প্রধান অতিথি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরিচয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর বক্তব্যে বরিশালের সমবায় বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়কে ক্রেস্ট প্রদান

সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান এবং মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক সমবায় বিভাগের জন্য গৃহিত সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সকলকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যে পুলিশ বিভাগের গণমুখী কার্যক্রমে সমবায়কে সম্পৃক্ত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন এবং অচিরেই সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পুলিশ বিভাগের মতবিনিময় সভা আয়োজন করার প্রস্তাব রাখেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়ের বরিশালে আগমন এবং সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মচরিগণকে দিক নির্দেশনা ও উদ্দীপনামূলক বক্তব্য প্রদানের জন্য নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মতামত অনুসারে বরিশাল বিভাগে সমবায়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হবিগঞ্জ জেলার সমবায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের মতবিনিময়

১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এর সাথে হবিগঞ্জ জেলার সমবায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। হবিগঞ্জ জেলা সমবায় কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। সিলেট বিভাগীয় সমবায় দপ্তরের যুগ্ম নিবন্ধক মৃনাল কান্তি বিশ্বাস বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন। কাজী রাশেদুজ্জামান উপ নিবন্ধক (অর্থ) ও নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের স্টাফ অফিসার, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এবং হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিক মন্ডল প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক বলেন, অকার্যকর ও অপ্রয়োজনীয় সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হবে। সমবায় সমিতিগুলোকে সফল/টেকসই সমিতি

হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের চিন্তা ধারাকে সামনে নিয়ে সমবায়ের জন্য কাজ করে যেতে হবে।

সুইজারল্যান্ডে ‘বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেটস’ রোড শোর প্যানেল আলোচনায় সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক

গত ২০-২২ সেপ্টেম্বরে সুইজারল্যান্ডে এ অনুষ্ঠিত বিএসইসির রাইজ অব বেঙ্গল টাইগার’ রোড শো’তে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি বিনিয়োগকারী এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তির বিবেচনায় ইউরোপের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ সুইজারল্যান্ডের দুটি শহর জুরিখ ও জেনেভাতে বাংলাদেশকে তুলে ধরে বিদেশি ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে প্রবাসীরা যাতে দেশে বিনিয়োগ করে সে বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়। গত ২০ সেপ্টেম্বর সুইজারল্যান্ডের জুরিখের ডোলডার গ্রান্ড হোটেলে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। গত ২২ সেপ্টেম্বর জেনেভায় সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক ড. তেদরোস আধানোম গেবরেয়াসুস উপস্থিত থাকতে না পারায় তাঁর শুভেচ্ছা বাণী পড়ে শোনানো হয়। বিএসইসি আয়োজিত রোড শোতে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফাইন্যান্স ডিভিশনের সিনিয়র সচিব আবদুর রউফ তালুকদার, বিএসইসির চেয়ারম্যান প্রফেসর শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম পিএ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল নজরুল ইসলাম, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য আলমগীর হোসেন এবং সমবায় অধিদপ্তের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস অংশগ্রহণ করেন।

‘বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৯ সেপ্টেম্বর.২০২১ খ্রিঃ Annual Performance Agreement (APA) বিষয়ক প্রশিক্ষণে সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা বক্তব্য রাখছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

সজীব ওয়াজেদ জয়ের উদ্ভাবনী নেতৃত্বেই দেশ আজ ডিজিটাল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্র ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের উদ্ভাবনী নেতৃত্বেই দেশ আজ ডিজিটাল বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি।

২৯ জুলাই ২০২১ সালে সচিবালয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ''ইন্ট্রিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম'' কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের সুদূরপ্রসারী ও উদ্ভাবনী চিন্তাচেতনাই আজকের প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ। তাঁরই দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ ডিজিটাল।

দক্ষ নেতৃত্ব ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে সজীব ওয়াজেদ জয়ের হাত ধরেই বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে বাংলাদেশ এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, নাগরিক সেবায় প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। জনসেবায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে দ্রুত ও সহজে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

'ইন্ট্রিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম' কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল আহসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, বিআরডিবির মহাপরিচালক সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, এটুআই-এর চীফ স্ট্যাটেজিস্ট (ই-গভর্ন্যান্স) ফরহাদ জাহিদ শেখ।

একটি পুরস্কার একটি মুগ্ধ প্রহর

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন' কম্পোনেন্টের সহকারী প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা সমবায় অফিসার, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও ফ্যাসিলিটেটর- এ চার ক্যাটাগরিতে ১০ জন প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কারণে পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক (প্রশাসন) মোঃ আহসান কবীর এর নিকট থেকে পুরস্কারের সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন। এ সময় উপপ্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারি উপস্থিত ছিলেন।

দেশীয় দুগ্ধশিল্পের বৈচিত্র্যময় প্রসারে কাজ করছে মিল্কভিটা : স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

খুলনার ডুমুরিয়ায় বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের খুলনা বিভাগের সমবায়ীদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণের চেক বিতরণ করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি। অনুষ্ঠানে মিল্কভিটার চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু উপস্থিত ছিলেন।

১১ সেপ্টেম্বর খুলনার ডুমুরিয়ায় বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের খুলনা বিভাগের সমবায়ীদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণের চেক বিতরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান। অনুষ্ঠানে ২০০ জন সমবায়ীর মধ্যে ২ কোটি ৪০ লাখ টাকার ক্ষুদ্র ঋণের চেক বিতরণ করা হয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটি শোষিত ও বঞ্চিত জাতিকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এ মুক্তি বলেতে তিনি অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেছেন। আর এই অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, সমবায় ছিল জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার। তিনি কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষিঋণসহ সবক্ষেত্রেই সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

বর্তমান সরকার কৃষকদের ভাগ্যের উন্নয়নে কাজ করছে জানিয়ে স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, দেশের দুগ্ধ উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মিল্কভিটা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। প্রতিষ্ঠানটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

সাতক্ষীরায় একটি মিনি ডেইরি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হচ্ছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটি সফল হলে সারা দেশে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ডুমুরিয়া উপজেলায় যেহেতু দুধের উৎপাদন বেশি তাই এখানেও একটি মিনি ডেইরি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ খুলনা সমবায় বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধকের পুরস্কার অর্জন

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ বিভাগীয় কার্যালয় ক্যাটাগরিতে ২য় পুরস্কার গ্রহণ করছেন খুলনা সমবায় বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক, মোঃ মিজানুর রহমান। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. হাছান মাহমুদ, মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও মোঃ মকবুল হোসেন, সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। পুরস্কৃত অন্যান্য কর্মকর্তাগণের মধ্যে রয়েছেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহফুজা আক্তার, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট মোঃ খলিলুর রহমান।

রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট খুলনা জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে রাড়ুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতা হরিশচন্দ্র রায়, মাতাঃ ভূবনমোহিনী দেবী। তিনি ১৮৬৬ সাল হতে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং সর্বশেষ ১৮৮৭ এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি.ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবনে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যে সকল উল্লেখযোগ্য দানের ভূমিকা রেখেছেন তার তালিকা নিম্নরূপ :

১। রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর প্রতিষ্ঠাতা।

২। রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর নাম ফলকে পিসি রায় এর ডিগ্রি যথা PC Roy, Kt.CIE, PhD, DSC, FCS, FRASB ডিগ্রি সমন্বিত আছে।

৩। রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাড়ুলী ও বাঁকা রাস্তার ইট দ্বারা তৈরি করেন। এছাড়াও তিনি ৫১টি প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিকভাবে অবদান রাখেন।

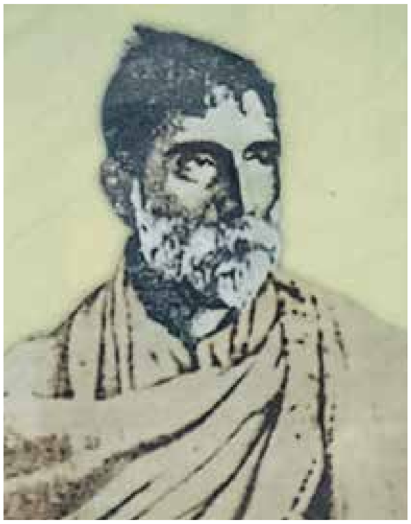

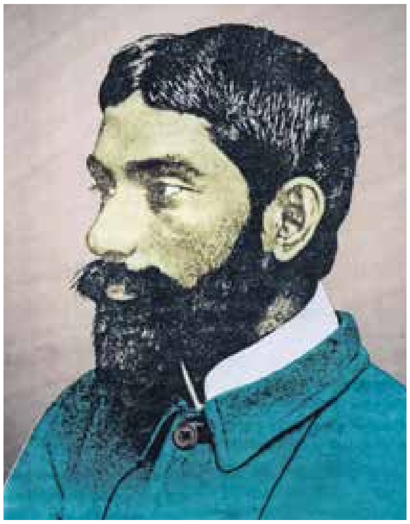

রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ প্রতিষ্ঠায় আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের উল্লেখযোগ্য তথ্য :

সমিতি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিবর্গ জানান যে, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের পিতা- হরিশচন্দ্র রায় তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার দক্ষিণ খুলনা তথা খুলনা জেলার পাইকগাছা, দাকোপ, কয়রা এবং সাতক্ষীরা মহাকুমার কলোরোয়া, তালা ও আশাশুনি এলাকার কৃষকদের চাষাবাদের জন্য গ্রাম্য মহাজনদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনি একটি লোন অফিস খোলেন এবং উক্ত এলাকার কৃষকদের মধ্যে সীমিত আকারে ঋণ দাদন প্রথা শুরু করেন। তখন এই লোন অফিস কৃষকদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তার পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়াশুনার জন্য ইংল্যান্ডে যান এবং অধ্যয়ন শেষে কর্মজীবনে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। সেই সকল দেশের জনগণের মধ্যে সমবায় চেতনার মনোভাব মনের ভিতরে রেখাপাত করায় নিজ দেশে ফিরে তৎকালীন দক্ষিণ খুলনার কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থা লাগবের চিন্তাচেতনায় রসডেল অগ্রণীদের সমতাবাদী সমবায় সমিতি নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে ১৯০৮ সালে নিজ জন্ম স্থান খুলনা জেলাধীন তৎকালীন পাইকগাছা থানার রাড়ুলী গ্রামের নিজ বাড়িতে এলাকার গণ্যমান্য ও সাধারণ জনগণকে একত্রিত করেন এবং একটি সমবায় ব্যাংক গঠন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপস্থিত অগ্রজ নলিনীকান্ত রায়সহ বিপিন বিহারী চক্রবর্তী , গোলক চন্দ্র বসু, কারী মোহাম্মাদ আলী, দানবীর মেহের মুছল্লী এবং নাম না জানা অনেক ব্যক্তিবর্গের আগমন ঘটে। সকলের উপস্থিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর আত্মপ্রকাশ ঘটে যার নিবন্ধন নং-৩/২৯; তারিখ : ০১/০২/১৯০৯ খ্রি.।

প্রকাশ থাকে যে, ১৯০৪ সালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন কর্তৃক সমবায় ঋণদান সমিতি আইন, ১৯০৪ জারী করায় অসীম দায়বদ্ধ বহুমুখী, কৃষি ও ঋণদান সমিতি নিবন্ধিত হওয়ায় আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ওই সকল সমিতিসমূহকে সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ১৯০৯ সালে ব্যাংকের অগ্রযাত্রা আনুষ্ঠীকভাবে শুরু করেন।

পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের ভবন নির্মিত হয়। বর্তমানে ব্যাংক ভবনটি নিজস্ব জায়গায় অবস্থিত। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় নিজস্ব জমি হতে ইং ১৯২৩ সালে রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ লিঃ এর নামে ০.৮৭ একর জমি দান করেন, ইহা ছাড়াও ব্যাংকের নামে বিলান (ধানের জমি) ও পুকুরসহ ১০.৫৯ একর জমি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের অনুকূলে খরিদ করেন। মোট খরিদকৃত জমির পরিমাণ ১০.৬৯ একর মাত্র এবং দানকৃত জমির পরিমাণ ০.৮৭ একর। সর্বমোট জমির পরিমাণ ১১.৫৬ একর মাত্র।

পরিশেষে রেকর্ডপত্র দৃষ্টে দেখা যায় যে, তিনি ১৯০৯ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত অত্র ব্যাংকের সভাপতি পদে উপবিষ্ট ছিলেন। এই ব্যাংকের আর্থিক লেনদেন বিষয়ে তদানীন্তন সময়ে অবিভক্ত ভারতের কলকাতা শহরে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়াতে ২৬/০৩/১৯৩৫ সালে ৫০০ টাকার মূল্যের শেয়ার খরিদ করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও রেকর্ডপত্র দৃষ্টে ভারত সরকার এর নিকট ২৯,৫৩০ টাকা পাওনা রয়েছে। যা ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর শেয়ার খরিদ বাবদ ৮,৬০০ টাকা,ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এ চলতি আমানত বাবদ ১,৪৩০/৬০ টাকা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর স্থায়ী আমানত বাবদ ১৯,০০০ টাকা পাওনা রয়েছে। আরও দেখা যায় যে, সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্পোরেট শাখা খুলনাতে ১৯৬৫ সাল হতে সেফ লকারে একটি ধাতব দ্রব্য রক্ষিত আছে। সেফলকারে রক্ষিত ধাতব দ্রব্যটির ভাড়া যথা সময়ে পরিশোধ করা হয়।

বিজ্ঞানী/গবেষক ও সমবায়ের প্রাণ পুরুষ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৯৪৪ সালের ১৬ জুন পরলোক গমন করেন।

বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ এর কারখানা পরিদর্শন করছেন সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার থেকে উদ্ধারের নিমিত্তে এদেশে সমবায় আন্দেলনের পথিকৃৎ ও কুমিল্লা পদ্ধতির জনক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) প্রতিষ্ঠাতা ড. আখতার হামিদ খানের অনুপ্রেরণায় ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় শিল্পভিত্তিক সমবায় সমিতি হিসেবে ১৯৬১ সালের ২৭ এপ্রিল কুমার ও পালদের সাতটি গ্রাম-উত্তর বিজয়পুর, দক্ষিণ বিজয়পুর, নোয়াপাড়া, গাণ্ডকুল, টেগুরিয়াপাড়া, দুর্গাপুর ও বারপাড়া নিয়ে গঠিত 'প্রগতি যুব সংগঠন'টিকে রূপান্তরিত করে 'বিজয়পুর মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ' গঠন করা হয় যা সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধন নং-৩৯; তারিখ : ২৯/০৮/১৯৬২ ইং মূলে নিবন্ধন লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্নে এর সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ জন। আমানত হিসেবে জনপ্রতি আট আনা করে মোট ৭ টাকা ৫০ পয়সা জমা করেন। শেয়ারে জনপ্রতি ১০ টাকা করে মোট ১৫০ টাকা ওঠে। মোট ১৫৭ টাকা ৫০ পয়সা মূলধন দিয়ে বিজয়পুর মৃৎশিল্পের যাত্রা শুরু হয়।

মৃৎশিল্প

এই সমবায় সমিতির প্রথম বাজার ছিল কুমিল্লা সেনানিবাস। এশিল্পের তৈরি পণ্য দেখতে বাইরে থেকে মানুষজন আসতেন। অনেকে তাঁদের পরিবার নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বিকেলে বিজয়পুরে বেড়াতে আসতেন। দেখে মুগ্ধ হতেন, কিনে নিতেন। এভাবে ধীরে ধীরে শিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে। ১৯৬৪-তে ঢাকার একটি সংস্থা আরআইএস (রুরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি) প্রথম তাঁদের ১২ হাজার টাকা ঋণ ও একটি কয়লার চুলা দেয়।

তাতে উৎপাদন এগিয়ে চলল পুরোদমে।
যুদ্ধে ছারখার, পরে আবার শুরু : ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী সমিতির অফিস ঘর ও উৎপাদন কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়। সমিতির সদস্য ও কুমারগণ, ‘এমন অবস্থায় নিরুপায় হয়ে ত্রিপুরা শরণার্থী শিবিরে গিয়ে জান বাঁচান। এতে সমিতির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। নয় মাস পর যখন দেশে ফিরে দেখেন কিছুই নাই। সর্বত্র কাঁটা-ঝোপ-জঙ্গলে ছেয়ে আছে। নিজেরা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে আবারও মৃৎশিল্পের কাজে মন দেন।’

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ইংল্যান্ড ও ভারত হয়ে দেশে ফিরে কুমিল্লায় আসেন। তাঁকে সংবর্ধনা দিতে কুমিল্লার অভয়াশ্রমে তখন বিশাল একজনসভার আয়োজন করা হয়। সেই সময়ে ‘ইন্দিরা-মুজিব’ একটি যৌথ ক্যালেন্ডার ছিল প্রায় সর্বত্র। তখন সেই ক্যালেন্ডার দেখে বিজয়পুর মৃৎশিল্প সমবায় সমিতির সদস্যরা একটি ত্রিমাত্রিক মডেল বানালেন প্লাস্টার দিয়ে। তা ওই জনসভায় সমিতির পক্ষ থেকে সম্মাননা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁদের কাজ দেখে মুগ্ধ হন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যক্রম পুনরায় চালু করার জন্য সরকারের ত্রাণ ও পুণর্বাসন দপ্তর থেকে সমিতিকে এককালীন ৭৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। সাথে স্বল্প মূল্যে ২০০ সিএফটি কাঠ এবং প্রয়োজনীয় টিন দেবার ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে বললেন। স্থানীয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় কাঠ, সিমেন্ট আর টিনের ব্যবস্থা করে দেন। আর অবকাঠামোগত কাজে এগিয়ে এসেছিলেন প্রকৌশলী আতাউর রহমান। ফলে ওই ৭৫,০০০ টাকা আর সরঞ্জামাদি দিয়ে একটি ঘর তুললে সমিতির শিল্প চালানোর মতো একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

ক্রমে ক্রমে উন্নতি

১৯৭৫ সাল। শেখ মুজিবুর রহমান তখন রাষ্ট্রপতি। জুন-জুলাইয়ের দিকে রাষ্ট্রপতির বিশেষ তহবিল থেকে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থাকে (বিসিক) সাড়ে চার লাখ টাকা দেওয়া হয় এখানে বৈদ্যুতিক চুলা বসানোর জন্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর সেই চুলা আর বসানো হলো না। বিসিক সেই বৈদ্যুতিক চুলা বসাল ১৯৮২ সালে। কিন্তু কয়েলে ত্রুটি ছিল বলে সেই চুলা কাজে এলো না। পরে ১৯৯১ সালে বিসিক আরেকটি চুলা বসায় ফার্নেস অয়েলের, যা এখনো বর্তমান। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৯৯৪ সালে সাড়ে আট কিলোমিটার দূর থেকে গ্যাস-সংযোগের

ব্যবস্থা করা হয়। এর পর থেকে উৎপাদিত পণ্য নষ্ট হওয়ার পরিমাণ কমতে থাকে। ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ থেকে কমে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে পণ্য নষ্ট হওয়ার হার। পণ্যের গুণগত মানও বৃদ্ধি পায়। আর বার্ষিক নিট লাভের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় আট থেকে সাড়ে আট লাখ টাকা। সেই টাকা দিয়ে তখন ৮৭ দশমিক ৫ শতাংশ জায়গাও কেনা হলো এই শিল্পের জন্য। উৎপাদন বাড়াতে ১৯৯৭-’৯৮ সালে সমিতির সদস্যরা ১২ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি কয়লার চুল্লি কেনেন। মৃৎশিল্পের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অবদান এবং কার্যক্রমকে আরো প্রসারিত করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতিকে ২,৬৩,০০,০০০ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করে, যা দিয়ে আধুনিক চুল্লি ক্রয়সহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হয়। তৎকালীন সময়ে সেখানকার গ্যাস সংযোগটি ডেডিকেটেড লাইন ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অবৈধ আবাসিক সংযোগ দেয়ায় কারখানাটির গ্যাসের প্রেসার কমতে থাকে যা বর্তমানে প্রায় শূন্য।

শুরুর সেই ১৫ জন থেকে সমিতির সদস্যসংখ্যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৯ জনে। তাঁদের মধ্যে ১৬৩ জন পুরুষ ও ৬৬ জন নারী সদস্য। ১৫৭ টাকা ৫০ পয়সা দিয়ে শুরু করা সমিতির মূলধন এখন দাঁড়িয়েছে সাত-আট কোটি টাকায়।

ক্রেতা-দর্শনার্থী

বিজয়পুর মৃৎশিল্পের বিজয় এখন বিশ্বজোড়া। রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবকটি দেশে।

১৩টি দেশের ক্রেতা-দর্শনার্থীদের ভিড় লেগেই থাকে বিজয়পুর মৃৎশিল্পে। বিদেশি দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়ছে দিনদিন। এই প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহের দিনও পাওয়া গেল জাপান, ভারত, তাইওয়ান, ইরান, মিসর, ঘানা ও আরও কয়েকটি দেশ থেকে আসা ১৬ জনকে। ঘানা থেকে আসা কিপো

জানালেন, তিনি পছন্দের কিছু পণ্য ঘানায় নিয়ে যেতে চান। চকচকে রং করা মসৃণ মাটির পণ্য দেখে মিসরের ক্রেতা তো বিশ্বাসই করতে পারছেন না এ যে শুধু মাটির তৈরি।

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় এ সমিতি এগিয়ে চলেছে। সামনে আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সে লক্ষ্যে মৃৎশিল্প কারখানাটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর মৃৎশিল্পের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে কাজ করে চলছে জেলা সমবায় কার্যালয়, কুমিল্লা। প্রায় ৪০০ পরিবারের ভরণপোষণ হয় এখান থেকে। দেশে ও বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে আমাদের এই দেশিয় পণ্য। যা আমাদের জন্যে অত্যন্ত গর্বের। সর্বোপরি গ্যাস সংযোগটি পূনরায় চালু হলে এ সমিতির কার্যক্রম আরও বেগবান হবে বলে ধারণা করা হয়। জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হতে ১৯৯১, ১৯৯৮ ও ২০১১ সালে তিনবার জাতীয় সমবায় পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণপদক লাভ করে। তাছাড়া ২০19 সালে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমিতির পুরস্কার লাভ করে।

সমিতির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় এ সমিতি এগিয়ে চলছে। সামনে আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সে লক্ষ্যে মৃৎশিল্প কারখানাটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কুমিল্লা শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি শোরুম করারও ইচ্ছা আছে। এ প্রতিষ্ঠানে দেশ বিদেশ থেকে বহু বরেণ্য ব্যক্তিরা পরিদর্শনে আসেন। তাদের সুবিধার জন্য ও মৃৎশিল্প সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানোর জন্য একটি মৃৎশিল্প যাদুঘর স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে সহযোগিতা চাইছি। সদস্যদের জন্য একটি বিনোদন কেন্দ্র ও একটি ক্যাফেটোরিয়া স্থাপনের পরিকল্পনাও আছে। তবে সেজন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সহযোগিতার প্রয়োজন।

মঠবাড়ি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী গাজীপুর জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের মঠবাড়ি গ্রামে অবস্থিত মঠবাড়ি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ। মঠবাড়ি মিশনের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সদস্য/সদস্যাদের দ্বারা ২ জুন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে. ইয়াং এর উদ্যোগে এবং শ্রদ্ধেয় ফাদার বার্গম্যান সিএসসি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতার মাধ্যমে মাত্র ৩০ জন সদস্য/সদস্যা নিয়ে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে অত্র সমিতির সদস্য সংখ্যা ২,৪৫৯ জন। পরবর্তীতে সমবায় বিভাগ কর্তৃক রেজিঃ নং ২৪/৮৪ এর মাধ্যমে অত্র সমিতি নিবন্ধন লাভ করে। সংশোধিত নিবন্ধন নং ৭৭/১৭ তারিখ ৮/৩/২০১৭। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর অত্র সমিতি দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্ব) কেন্দ্রীয় সমিতির আওতাভুক্ত হয়। সদস্য নং : ৬।

অত্র সমিতি একটি সম্পূর্ণ সেবামূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এই সমিতির

কার্যকরী মূলধন ১১৬,৯৬,৬০,৭৩৭ টাকা। তাছাড়া সমিতির মোট ৪৪৯.৪৩২ শতাংশ জমি রয়েছে যার বর্তমান মূল্য ৩০,৯৪,৭০,৭০৭ টাকা। বর্তমানে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১২ জন বোর্ড সদস্য, ঋণদান পরিষদ ৫ জন সদস্য এবং পর্যবেক্ষণ পরিষদে ৫ জন সদস্য সহ মোট ২২ জন সদস্য তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। সমিতির কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন ও গতিশীল করার জন্য মোট ১২ জন স্থায়ী কর্মী ও ৭ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী রয়েছে। এছাড়াও অত্র সমিতিতে ৩২ জন ডেইলি বেসিক কালেক্টর নিয়োজিত রয়েছে। সদস্যদের সুবিধার্থে ও সমিতির সাথে তাদের লেনদেন আরও সহজ করার জন্য এলাকাভিত্তিক বুথ রয়েছে।

সদস্যদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সমিতি সদস্যদের সেবা প্রদান করে থাকে। একজন সদস্য সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এই ঋণ গ্রহণ করে সদস্যরা হাঁস-মুরগির খামার, গাড়ি ক্রয়, উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন, দোকান, ঘড় তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। এছাড়াও অত্র সমিতি বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও যুব উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান করে থাকে।

বিগত বছর অত্র সমিতি কোভিড ১৯ (করোনা) মহামারিতে সমিতির সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে সর্বমোট ৮০০ প্যাকেট ৮০০ পরিবারকে প্রায় ১২ লক্ষ টাকার খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছে।

২০১১ খ্রিস্টাব্দ সমবায়ের মাধ্যমে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার প্রশংসনীয় স্বীকৃতিস্বরূপ অত্র সমিতি সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায় শ্রেণিতে শ্রেষ্ঠ সমবায় ২০১১ জাতীয় সমবায় পুরস্কার স্বর্ণপদক লাভ করে।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে অত্র সমিতি জাতীয় পর্যায়ে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্ব) এর সর্বাধিক আমানতকারী হিসেবে প্রথম ও জাতীয় পর্যায়ে মূলধন বৃদ্ধিতে দ্বিতীয় এবং গাজীপুর অঞ্চলে মূলধন বৃদ্ধিতে প্রথম ক্রেডিট ইউনিয়ন হিসেবে কাল্ব সনদ-২০১০ অর্জন করে।

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ সমবায়ের কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশ গঠনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অত্র সমিতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গাজীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার অর্জন করে।

সমবায় আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী অত্র সমিতিতে নিয়মিত মাসিক বোর্ড সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা ও যথাযথভাবে নির্বাচন কার্যক্রম হয়ে আসছে।

সদস্যদের আর্থিক উন্নয়ন ও সমিতির মূলধন দ্রুত বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অত্র সমিতিতে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিশু সঞ্চয়, দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়, ড্রাফট কার্যক্রম, স্থায়ী আমানতসহ বিভিন্ন প্রোডাক্ট চালু করা হয়।

অত্র সমিতিতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সরকারি প্রতিমন্ত্রী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং বিশেষ অতিথিগণ পরিদর্শন করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১২ খ্রিস্টাব্দ ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত ডক্টর মিহির কান্তি মজুমদার, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত জনাব মোঃ হুমায়ুন খালিদ, নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা, সম্মানিত শ্রী প্রতুল কুমার সাহা, যুগ্ম নিবন্ধক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা। সেইসাথে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত জনাব নূর মোহাম্মদ মামুন, জেলা সমবায় অফিসার, গাজীপুর। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ ৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত

জনাব মোঃ হুমায়ুন খালিদ, নিবন্ধক ও পরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত জনাব মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি, প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গাজীপুর-৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সম্মানিত জনাব নূর মোহাম্মদ মামুন, জেলা সমবায় অফিসার, গাজীপুর। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ সমিতির নিজস্ব জায়গায় সীমানা নির্মাণ প্রাচীরের কাজের শুভ উদ্বোধন করেন সম্মানিত জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন খালিদ, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক (অতিরিক্তি সচিব), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ ৪১ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শেরে-ই বাংলা নগর, ঢাকা। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত জনাব মোল্লা মোহাম্মদ নিয়ামুল বাসার, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ ৪৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত জনাব মোঃ আবুল খায়ের, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ ৪৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি। ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সমিতির ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মাদ সাদ্দাম হোসেন, জেলা সমবায় অফিসার, গাজীপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মির্জা ফারজানা শারমিন, উপজেলা সমবায় অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর। ১৭/০৮/২০২১ খ্রিস্টাব্দ সম্মানিত জনাব মোঃ রিয়াজুল কবীর, বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা সহ আরো অন্যান্য সম্মানিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অত্র সমিতি পরিদর্শন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিশেষ দিনগুলোতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, জেলা ও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও বিশেষ অতিথিগণ সমিতিতে পরিদর্শন করে থাকে।

সমবায় আন্দোলনের দুটি কথা

সমবায় সংগঠনের সকল সদস্যদের সমান অধিকার। এখানে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র,

নারী-পুরুষের পার্থক্য নেই। সমবায়ে সদস্যরা পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে নিজেরা নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করার লক্ষ্যে সমিতি গঠন করে।

মঠবাড়ি ধর্মপল্লীর কয়েকজন প্রান্তিক ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে একত্রিতভাবে সীমিত আকারে কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মার্চ ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ৩০ জন সদস্য ৯৯,০০০ টাকা পরিসম্পদ নিয়ে প্রাথমিকভাবে সমিতির কার্যক্রম শুরু করেন। তারই ধারাবাহিকতায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ায় ১ জুন সমিতির প্রতিষ্ঠার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। সমিতির কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে গাজীপুর জেলা সমবায় কার্যালয় থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করেন, যার নিবন্ধন নম্বর: ২০১৫, তারিখ: ১২-০৬-২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

সমিতির কার্যক্রম

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ রবার্ট পংকজ গমেজ। তিনি দীর্ঘ ৭ বছর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বিগত ৪ মে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ নির্বাচন (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়) অনুষ্ঠিত হয় এবং ১০ মে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বর্তমান চেয়ারম্যান মিঃ সুরেন রিচার্ড গমেজ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বর্তমানে সমিতির পরিসম্পদের পরিমাণ ১,৫৫,০০,০০০ টাকা। কর্মী সংখ্যা ৫০ জন। জমির পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক। ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সদস্য সংখ্যা ৫০৯ জন। অত্র সমিতির এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ ও অন্যান্য কমিটি তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সমিতির প্রকল্পসমূহ

অত্র সমিতি নিজ কার্যক্রমে পরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে। সমিতির স্লোগান হচ্ছে- "আমাদের অর্থ আমরা করবো ব্যবহার, হবে সোনালী সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের হাতিয়ার"। সমিতির তার নিজস্ব ব্র্যান্ড হিসেবে কেএসবি যার সম্পূর্ণ অর্থ হলো- "ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় বিজনেস"-ব্যবহার করে আসছে।

১) কেএসবি সমবায় বাজার
২) কেএসবি পরিবহণ সার্ভিস
৩) কেএসবি ভূমি
৪) কেএসবি বিল্ডার্স
৫) কেএসবি বাণিজ্যিক ভবন
৬) কেএসবি বিউটি পার্লার অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার
৭) কেএসবি জিম অ্যান্ড ফিটনেস সেন্টার
৮) কেএসবি বেকারি
৯) কেএসবি বেকারি অ্যান্ড পেস্ট্রি শপ্
১০) কেএসবি ক্ষমা ও ভালোবাসা সংঘ, (অঙ্গ সংগঠন)

সমিতির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- সমিতি তার জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক এবং সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
- কেএসবি ক্ষমা ও ভালোবাসা সংঘের মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি এবং আর্থিক অনুদান প্রদান।
- যুব উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আত্মনির্ভরশীল কার্যক্রম সৃষ্টি।
- নাগরী ইউনিয়নের জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা এবং সম্মানী প্রদান।
- দেশের ঐতিহ্যকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন।
- প্রতিবছর অত্র সমিতির সদস্য, কর্মকর্তা এবং কর্মীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন।
- ছাত্র প্রকল্প (ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষার পাশাপাশি সম্মানির বিনিময়ে অর্ধবেলা কাজের সুযোগ সৃষ্টি)।
- গ্রামের উন্নয়নের জন্য গ্রামভিত্তিক যুব সংগঠনকে প্রতিনিয়ত আর্থিক এবং মানসিকভাবে সহযোগিতা প্রদান।
- বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের ফলে কর্মহীন এবং নিম্ন আয়ের জনসাধারণের মাঝে ৭,৭২,১৩০.০০ টাকা খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে আরও ১,০০,০০০ টাকা খাদ্য দেয়া হয়েছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আদর্শকে তুলে ধরার জন্য কেএসবি বাণিজ্যিক ভবনের ৪র্থ তলায় মুজিব কর্ণার ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সমিতির অর্জন

- সমিতি তার নিজ কাজের স্বীকৃতি-স্বরূপ কয়েকটি পুরস্কার অর্জন করেছে।
- ২০১৮ সালে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবসে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ক্যাটাগরিতে গাজীপুর জেলায় শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার অর্জন করে।
- ২০১৮ সালে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবসে কালীগঞ্জ উপজেলায় সফল সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার অর্জন করে।
- ২০১৯ সালে গাজীপুর জেলায়সমবায় পণ্য মেলায় ৩য় পুরস্কার অর্জন করে।
- ২০২০ সালে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসে গাজীপুর জেলায়শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার অর্জন করে।
- ২০২০ সালে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসে কালীগঞ্জ উপজেলায় সফল সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার অর্জন করে।

প্রশিক্ষণ

অত্র সমিতির কর্মীদের কাজের মান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পেশাদারিত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে নিজ সমিতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সমিতি পরিদর্শন

সমিতির জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ অত্র সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শন করে আসছে।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, সচিব,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

জনাব মোহাম্মদ রিয়াজুল কবীর, যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা।

সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকে গাজীপুর জেলা সমবায়ের সকল কর্মকর্তাগণ এবং কালীগঞ্জ উপজেলা সমবায়ের সকল কর্মকর্তাগণ অত্র সমিতি পরিদর্শন করেন।

উপসংহার

সমিতির উন্নয়ন আমাদের উদ্দেশ্য এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিকভাবে সমিতির সদস্যদের ভাগ্য পরিবর্তন আমাদের মূল লক্ষ্য।

আলিফ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

শস্যের ভান্ডার হিসেবে খ্যাত বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে ১৯৯৪ সালে গঠিত হয় 'আলিফ বহুমুখী সমবায় সমিতি লি '। প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতির সদস্যগণ কিছু অর্থ সঞ্চয়ের মধ্যেই তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখত। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সমিতির কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সদস্যরা তাদের পেশার সাথে মিল রেখে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। যার ফলে সমিতির বর্তমান নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ ৪,৪১,৭৭,১৩৩ টাকায় উন্নীত হয়।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

এ সমিতরি বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৪৯ জন। নিজস্ব মূলধনেই সমিতির যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে গরুর মাংস প্রকল্প, বীজ উৎপাদন প্রকল্প, গাড়ি ক্রয় প্রকল্প, গোবর সার প্রকল্প, মৎস্য চাষ প্রকল্প, শাকসব্জি উৎপাদন প্রকল্প চালু আছে। এছাড়া সমিতির স্বল্প আয়ের কর্মচারী এবং শ্রমিকবৃন্দকে চিকিৎসা, শিক্ষা, কন্যা বিবাহ ও গৃহনির্মাণ খাতে সমিতির মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতির বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ জনের অধিক লোকের স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতিটি সমবায় আইন, বিধিমালা ও বিভাগীয় সকল আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করে থাকে। করোনা মহামারিতে সমিতির দরিদ্র্য সদস্য ও সাধারণ জনগণের মাঝে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়া শীতার্ত জনসাধারণের মাঝে প্রতিবছরই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ০৭/০১/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত বর্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটির ১২ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

বিগত বছরে বিভিন্ন প্রকল্প ব্যবসায় ১,০৪,৩৯,৩০৩

টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরগুলোতে সমিতি দ্রব্য ঋণ প্রদান করে ৫৬,৬১,৭৭৯ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। বিগত অর্থবছরে সমিতি সদস্যদের মাঝে ১,৬০,১০,০০০ নগদ ঋণ বিতরণ করেছে। মূলত সমিতির সদস্যদের চাহিদা এবং এলাকার কৃষি ও ব্যবসার বাস্তব চিত্রের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রকল্প গঠন পূর্বক বিনিয়োগ করা হয়।

কেস স্টাডি

সমিতিটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। অত্যন্ত দক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত এ কমিটি সমিতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে তত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভায় সমিতির সদস্যদের মতামতের উপর বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানের পথ খোঁজা হয়।

যেভাবে সমবায় সমিতিটি সফল হলো

দীর্ঘ ২৭ বছর সমিতির সকল সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা ও নিষ্ঠা, নতুন নতুন বাস্তবমুখী প্রকল্প গ্রহণ এবং উপজেলা সমবায় কার্যালয় কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং এর কারণে বাবুগঞ্জ উপজেলা তথা সমগ্র দক্ষিণ জনপদের মধ্যে একটি অনন্য সংগঠনে পরিণত হয়েছে। সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবাদি পশু, কৃষি, মৎস্য চাষ ও হাঁস-মুরগি পালনে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া সদস্যদের মাঝে দক্ষতা ও চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান এবং কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হয়। যার ফলে সমিতিতে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতিটি সদস্যদের মাঝে নিয়মিত লভ্যাংশ বিতরণ করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অডিট ফি পরিশোধের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধের পরিমাণ ৪,০০০ টাকা।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির নামে রুপালী ব্যাংক লিঃ, রহমতপুর শাখা, বরিশাল এ ২ টি হিসাব চালু আছে। যার মধ্যে একটিতে ৩০/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখ স্থিতির পরিমাণ ১০,০৫,০১৮ টাকা এবং অন্যটিতে স্থিতির পরিমাণ ৬৫,২৭৬ টাকা।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতিটি নিবন্ধনের পর বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের ফলে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ জনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র' রহমতপুর এ কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী এ সমিতির সদস্য, সেহেতু সমিতির সকল প্রকল্প কৃষিভিত্তিক। যা বাংলাদেশের ন্যায় একটি কৃষিপ্রধান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর লালিত স্বপ্ন ছিল সমবায়ের মাধ্যমে দেশকে আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি ঘটানো। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমবায়ের মূলমন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলিফ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অপরিসীম ভূমিকা রাখছে।

পঞ্চম বর্ষে 'ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস' ও বর্ষপূর্তি উৎসব

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে 'ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' এর বর্ষপূর্তি উৎসব, নবীন বরণ ও বিশেষ সাধারণ সভা দ্যা গ্রীন লাউঞ্জ, পায়ন ট্রেড সেন্টার, বাংলামটর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও গবেষক মোঃ আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, খঃ মাহবুবুল হক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল (এআইজি), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, বাংলাদেশ পুলিশ এবং এম. নাজমুল ইসলাম, ক্রীড়া সংগঠক ও ব্যবসায়ী। 'ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডিএমপি'র অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

এ বছর সংগঠনটিতে আরও ৩২ জন বিভিন্ন ক্যাডারের বিসিএস কর্মকর্তা সদস্য পদ গ্রহণ করেন। ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস ৫ম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে সমিতির বিভিন্ন ক্যাডারের ৪৮ জন বিসিএস কর্মকর্তা পেশাদারিত্বের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগোপযোগী ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

'ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডিএমপি'র অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, স্বপ্ন ও বাস্তবতার মেলবন্ধন-ই জীবন। 'ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সমাজের জন্য কিছু করবার উদ্যোমী মনোভাব প্রকাশ করে আসছে এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নে সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও একতার নিদর্শন বজায় রেখে সমবায় কার্যক্রম শক্তিশালী করতে বিগত ৪ বছরে নানা সামাজিক ও মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মুলাদী উপজেলার চর কমিশনার গ্রামে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

বঙ্গবন্ধু'র ভিলেজ কো-অপারেটিভ বাস্তবায়নে

সমবায় অধিদপ্তরের বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা শুরু

মোঃ সাইফুল ইসলাম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় দর্শন অনুযায়ী গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামকে উন্নত ও আধুনিক গ্রামে রূপান্তর করার জন্য বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পটি গ্রামকে কেন্দ্র করে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ হলো- নির্বাচিত গ্রামে উপকারভোগী নির্বাচন এবং গ্রামের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা করা, নির্বাচিত গ্রামের সকল শ্রেণী-পেশার জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি করে মোট ১০টি গ্রাম সমবায় গঠন করা, নির্বাচিত গ্রামসমূহের জনগণকে প্রকল্পের কার্যক্রম, সম্ভাব্য সুফল এবং অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং উপজেলার বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ প্রশিক্ষণ প্রদান করা, কৃষি ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে দক্ষতা উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া, গ্রামে উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রাথমিক সংরক্ষণের লক্ষ্যে সমবায় সমিতির কমিউনিটি ভবনে ক্ষুদ্র পর্যায়ের সংরক্ষণাগার ও বিপণনের ব্যবস্থা করা। এসব কার্যক্রম সম্পাদনে উপজেলা পর্যায়ে সরকারের ১৭টি দপ্তরের বিভিন্ন সেবা গ্রাম পর্যায়ে প্রাপ্তিতে সহায়তা করা হবে।

দেশের ৭টি বিভাগের ৯টি জেলার ১০টি গ্রামকে এ প্রকল্পের পাইলটিং করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাইলটিং এ সুবিধাভোগী গ্রামগুলো হলো- ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতি-শ্রীরামকান্দি গ্রাম, শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার চরভাগা মিয়ারচর গ্রাম, টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলার মুশুদ্দি গ্রাম, ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার চর ভাটিয়ানি গ্রাম, চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার পোমগাঁও গ্রাম, সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার ডুংরিয়া গ্রাম, খুলনা বিভাগের যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার পাড়ালা গ্রাম, রংপুর বিভাগের রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার রতিয়া গ্রাম, বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ গ্রাম এবং মুলাদী উপজেলার চর কমিশনার গ্রাম। নির্বাচিত গ্রামসমূহ হতে প্রত্যক্ষভাবে গড়ে ৫০০ জন করে মোট ৫,০০০ জন উপকারভোগী এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী হবেন। প্রকল্পভুক্ত ১০টি গ্রামে সমিতির সদস্যদের সম্মতিক্রমে আইলবিহীন চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

এ প্রকল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের ব্যক্তি পর্যায়ে চাহিদার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিনা সুদে ঋণ প্রদান করা হবে। ৩% সার্ভিস চার্জসহ উক্ত ঋণ ফেরত প্রদান করতে হবে। ঋণ গ্রহণের ৬ মাস পর ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু করতে হবে। এছাড়া কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তি পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যোক্তা খাতে প্রতিটি গ্রাম সমবায় সমিতির অনুকূলে আবর্তক তহবিল হিসেবে ২ কোটি টাকা হিসেবে মোট ২০ কোটি টাকার তহবিল থাকবে। কোন সমবায় সমিতি নিজ উদ্যোগে জমি প্রদান করলে সমিতিকে কেন্দ্র করে গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি কমিউনিটি ভবন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করে দেয়া হবে। কমিউনিটি ভবনে বঙ্গবন্ধু পাঠাগার ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার, নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ

কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০০ জনের কমিউনিটি হল, সমিতির অফিস কক্ষ, ১ টি প্রশিক্ষণ কক্ষ, ডিজিটাল সেবা কেন্দ্র, বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি রাখার গোডাউন, সংরক্ষণাগার, প্রদর্শনী কেন্দ্র এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ থাকবে।

বঙ্গবন্ধুর ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে ১০টি গ্রামে অংশীজন অবহিতকরণ সভা ও উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। এরই অংশ হিসেবে নিম্নবর্ণিত গ্রামসমূহে এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

জেলা : বরিশাল, উপজেলা : মুলাদী, গ্রাম : চর কমিশনার

বিগত ১৪ অক্টোবর ২০২১ সালে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল বলেই আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। স্বাধীন একটি দেশে বাস করতে পারছি। মুলাদী উপজেলার কাজিরচর ইউনিয়নের চর কমিশনার গ্রামকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেগম শামছুন্নাহার শিশুকল্যাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অংশীজন অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু সমবায় এর মাধ্যমে দেশকে সাজাতে চেয়েছিলেন। তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোগ নিয়েছেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রকল্পের উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ইউএনও নূর মোহাম্মদ হোসাইনী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশাল বিভাগীয় সমবায় দপ্তরের যুগ্ম নিবন্ধক আব্দুল্লাহ আল মামুন, বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রামের প্রকল্প পরিচালক মো. হেলাল উদ্দীন, উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ তারিকুল হাসান খান মিঠু, মুলাদী পৌর মেয়র শফিক উজ্জামান রুবেল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল বারী, বাবুগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সরদার খালেদ হোসেন স্বপন, মুলাদী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. দেলোয়ার হোসেন, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (মুলাদী সার্কেল) মো. মতিউর রহমান, কাজিরচর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আলহাজ মন্টু বিশ্বাস।

জেলা : কুমিল্লা, উপজেলা : মনোহরগঞ্জ, গ্রাম : পোমগাঁও

কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার পোমগাঁও গ্রামে অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

বিগত ১১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার পোমগাঁও গ্রামে বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' পাইলট প্রকল্প অংশীজন অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মনোহরগঞ্জ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাকির হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সভায় বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথি ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, কয়েকটি কারণে আজকে আমি আনন্দিত। এর মধ্যে এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর জন্মস্থান পোমগাঁওয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাবনা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' পাইলট প্রকল্প অংশীজন অবহিতকরণ সভায় জনগণের সামনে কিছু বলতে আজকের এ সভাটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' প্রকল্পের সমবায় অধিদপ্তরের পুরো টীম এখানে উপস্থিতি। তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা'র কম্পোনেন্ট সুফলভোগীদের বোঝানোর পরামর্শ দেন মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী। তিনি আইলবিহীন জমি চাষাবাদের কথা বলেছেন এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস বলেন যে, স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পাকবাহিনী এ দেশকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু উন্নয়ন জোয়ারের মাধ্যমে সোনার বাংলা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উন্নয়ন বিরোধীরা ৭৫ এর কালোরাতে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে উন্নয়নকে করে বাধাগ্রস্ত। তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' পাইলট প্রকল্প সফল হলে আপনার আমার গ্রাম হবে শহর। এর দেখাদেখি বাংলাদেশের ৭৫,০০০ পুরো গ্রাম হবে শহর। এর ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে গ্রামকে শহরে রূপান্তর করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, এ প্রকল্পে একটি কমিউনিটি সেন্টার হবে। এখানে গ্রামের মানুষের সমস্যা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সেবাসহ বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলাপ আলোচনা করা যাবে। উপজেলার ১৭টি দপ্তর এ প্রকল্পে সেবা দান করবে। এ গ্রামে ২কোটি টাকা ঋণ দেয়া হবে। এতে শুধুমাত্র ৩% সার্ভিস চার্জ হিসেবে দিতে হবে। প্রদত্ত ঋণ এ গ্রামে আবর্তক হিসেবে থাকবে। এখানে কৃষক, মৎসজীবীরা তাদের অর্থের চাকা ঘুরাতে পারবেন। সরকারের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এখানে যারা জড়িত আছে তারা সকলে সহযোগিতা করবেন এটা আমরা আশ্বস্ত হয়েছি।

সারা দেশের ৯টি জেলার ১০টি উপজেলার একটি করে গ্রামে 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' পাইলট প্রকল্প হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এর মধ্যে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার পোমগাঁও গ্রাম একটি। প্রকল্প পরিচালক ও সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্ম নিবন্ধক হেলাল উদ্দিন 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' পাইলট প্রকল্পের বিস্তারিত বিষয়াদি সুফলভোগী গ্রামবাসীদেরকে সভায় অবহিত করেন।

জেলা : রংপুর, উপজেলা : মিঠাপুকুর, গ্রাম : রতিয়া

বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের অংশীজনের অবহিতকরণ সভা গত ২১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের রতিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। মিঠাপুকুর ইউএনও ফাতেমাতুজ জোহরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাবেক সচিব মো. রেজাউল আহসান, রংপুর বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক মো. মোখলেছুর রহমান, উপজেলা আ.লীগের সভাপতি মো. মোজাম্মেল হক মিন্টু মিয়া, ইউপি চেয়ারম্যান মো. আবদুর রউফ।

প্রকল্পের সার্বিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা উপস্থাপন করেন মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, যুগ্ম নিবন্ধক সমবায় অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম পাইলট প্রকল্প।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস রতিয়া গ্রামের উপস্থিত সবাইকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুণর্গঠনে সমবায়কে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু প্রতি গ্রামে সমবায় করতে চেয়েছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি গ্রামে শহরের সুবিধা সৃষ্টি করার উদ্যোগ নিয়েছেন। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক বলেন যে, পাইলট প্রকল্পে মাত্র ১০টি গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। গ্রামে আইলবিহীন যৌথচাষের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। গ্রামের উন্নয়ন কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারী সেবা গ্রামে পাওয়া সহজ হবে।

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার রতিয়া গ্রামে অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

জেলা : বরিশাল, উপজেলা : গৌরনদী, গ্রাম : হোসনাবাদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রতিটা গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে দেখতে চান বলে জানিয়েছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস। গত ৩১ অক্টোবর ২০২১ সালে বরিশালের গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ নিজাম উদ্দিন কলেজ হলরুমে বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্পের অংশগ্রহণ অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সমবায় ভাবনার একটি অংশ হিসেবে দেশের প্রতিটা গ্রামকে শহরে রূপান্তর করতে চান। তিনি আরও বলেন, সারাদেশে ১০টি 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম' গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করছে সরকার। এর মধ্যে বরিশালের গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ ও মুলাদী উপজেলার চর কমিশনার গ্রামকে 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম' হিসেবে গড়ে তোলা হবে। অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিপিন চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সচিব মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ, গৌরনদী উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দা মনিরুন নাহার মেরী, পৌরসভার মেয়র মোঃ হারিছুর রহমান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এইচএম জয়নাল আবেদীন, ভাইস চেয়ারম্যান নুরুজ্জামান ফরহাদ মুন্সী, জিনিয়া আফরোজ হেলেন, ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক হোসেন মোল্লা, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মনির হোসেন মিয়া, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আনিসুর রহমান।

বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ গ্রামে অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রাপ্ত সমবায় সমিতি ও সমবায়ীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রঃ নং	শ্রেণিভিত্তিক সমবায়	সমবায় সমিতি/সমবায়ীর নাম ও ঠিকানা
১.	কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায়	**দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ** গ্রাম: কাশিনাথপুর, পোস্ট: হালিমানগর, উপজেলা: আর্দশ সদর, জেলা: কুমিল্লা।
২.	সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায়	**ভদন্ত শাসন রক্ষিত ভিক্ষু** সভাপতি, দি বুড্ডিষ্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ গ্রাম-কদলপুর, ডাকঘর- কদলপুর, উপজেলা- রাউজান, জেলা-চট্টগ্রাম।
৩.	দুগ্ধ সমবায়	**পোতাজিয়া প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ** গ্রাম- পোতাজিয়া, ডাকঘর-পোতাজিয়া, উপজেলা- শাহজাদপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ।
৪.	মহিলা সমবায়	**বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ** গ্রাম: নুরেরচালা, পো: বনানী, থানা-বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
৫.	বহুমুখী সমবায়	**জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ** গ্রাম- খুকড়া, ডাকঘর: খুকড়া, উপজেলা: ডুমুরিয়া, জেলা: খুলনা।
৬.	মৎস্য সমবায়	**মনাটেক যাদুগানালা মৎস্য চাষ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ** গ্রাম: মনাটেক, ডাকঘর: মহালছড়ি, উপজেলা: মহালছড়ি, জেলা: খাগড়াছড়ি।
৭.	মুক্তিযোদ্ধা সমবায়	**বীর মুক্তিযোদ্ধা আগা খাঁন মিন্টু (সংসদ সদস্য)** মিরপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সেকশন-১, মিরপুর বিশিল বাণিজ্যিক প্লট-৯, ঢাকা-১২১৬।
৮.	বিত্তহীন, ভূমিহীন সমবায়	**কাজিয়াকান্দা ভূমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ** গ্রাম: কাজিয়াকান্দা, পোস্ট: ফুলপুর, উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ ।
৯.	যুব, বিশেষ শ্রেণী, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়	**মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ** গ্রাম: মঠবাড়ী, পোস্ট: উলুখোলা, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
১০.	কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিবহণ শ্রমিক কর্মচারী সমবায়	**বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ (চব্রেসো)** বাংলাদেশ ব্যাংক (পুরাতন ভবন), কোর্ট রোড, কোতোয়ালী,চট্টগ্রাম।

SAMABAYA ● Special Issue, November 2021 ● Price Tk 25.00 ● Regd No. DA-41

বাংলাদেশের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রযাত্রা...

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B, Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 9140877 I Editor : Md. Saiful Islam